নগরে নারীর একক জীবন : পাঠক প্রতিক্রিয়া

অনামিকা রুখে দাঁড়ান

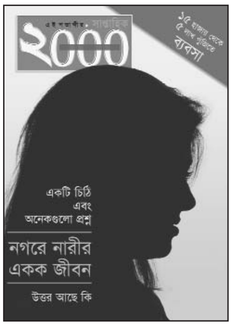

নারী-পুরুষের অধিকার আর আইনের সমস্যার বাইরে আরো কিছু সমস্যা আছে। যা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তার মুখোমুখি হতে হয়। বিষয়টি সামাজিক। যে সমস্যাকে ভিত্তি করে অনামিকার চিঠি ২০০০-এ প্রকাশিত হয়, চিঠিটা মূলত হৃদয় জানালা থেকে সম্পাদকের টেবিলে যায়। সেখানে ২৫ এপ্রিল সিদ্ধান্ত হয় এটা নিয়ে প্রচ্ছদ করা যেতে পারে। চিঠিটার বহুমাত্রিকতার জন্যে তাৎক্ষণিক সম্পাদকীয় বক্তব্য জুড়ে না দিয়ে পাঠকের মতামত আহ্বান করা হয়। যার সাড়া পড়ে দেশব্যাপী। এখানে বেরিয়ে আসে বিশাল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। তার থেকে বাছাই করে কয়েকটি মতামত এখানে প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থনা : ২০০০-এর সম্পাদকীয় বিভাগ

অনামিকার চিঠি নগর জীবনে একজন রমণীর একক লড়াইয়ের বর্ণনা হলেও তা টান দিয়েছে সমাজের শেকড় ধরে। পাঠককে মুখোমুখি করেছে সমস্যাটা কি এককের? সমাজের? একক মেয়েটির প্রতিপক্ষ কে? সমাজ? পুরুষ? দারিদ্র্য? না অন্য কিছু?

না, অনামিকা কোনো নির্ধারিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেখেননি। এ তার নিজের কথা, এ সময়ের কথা। এক নগরবাসী মহিলার কথা। কিছু প্রশ্ন করেছেন। যার উত্তর দেয়া যায়, সমাধান দেয়াযায় না। অসংখ্য মতামত এসেছে। মেয়েরা প্রচুর লিখেছেন। তারা মূলত ঐকমত্য পোষণ করেছেন অনামিকার সঙ্গে। বলেছেন তারাও একই সমস্যার শিকার। অংশগ্রহণ করেছেন, মতামত দিয়েছেন অনেক পুরুষ পাঠক। এখানে প্রকাশিত মতামতের মধ্যে পুরুষের মতামতই প্রাধান্য পেয়েছে প্রেক্ষাপণের বৈচিত্র্যের জন্য।

প্রচ্ছদের অনামিকা কিন্তু অনামিকা নয়। যদি বলা হয় এর নাম রানু বা বানু, অসুবিধা নেই। হতে পারে রুমা। কোন রুমা?

দু'বছর আগে এ রুমা বেশ পরিচিত ছিলেন মডেল হিসেবে। ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল শো বিজে থাকবে। নাচ শিখতো তারপর হয়ে যায় লাক্সের সেরা 'ফটোসুন্দরী' ১৯৯৭ সালে। প্রচ্ছদে পোস্টারে নাম ছড়ালো। মডেলিং ডাক পড়লো চারদিকে। ব্যস্ত হয়ে গেলো। নির্মাতা অভিনেতা আফজালের সঙ্গে বিটিভির ঈদের নাটকে অভিনয়ও করলো। তারপর গায়েব দু' আড়াই বছর। সপ্তাহ কয়েক আগে হঠাৎ এসে হাজির আনন্দধারার অফিসে। বললো, আমি শো বিজে ফেরত আসতে চাই। কোথা থেকে ফেরত আসবে? ফেরত আসবে বন্ধন থেকে বাইরে। সব ছেড়ে আবার আসতে চায় আত্ম-পরিচয়ের সন্ধানে। ফারাহ আলম রুমা নামে খুঁজে ফিরে পেতে নিজেকে।

শো বিজে যখন তুঙ্গে তখন একজন প্রচ্ছদে ছবি দেখে, তার গ্ল্যামারের প্রেমে পড়ে ফোন করতে থাকে। কিন্তু রুমা কেরিয়ারের কথা ভেবে এড়িয়ে চলতে চাইলেও জড়িয়ে পড়লো।

রুমা দেখলো ভক্ত তার কাজের প্রশংসা করছে, উৎসাহ জোগাচ্ছে। প্রেমে আর বাধা বোধ করলো না রুমা। এই প্রেমিকের নাম প্রিন্স। খুবই বিত্তবান পরিবারের সন্তান। রুমা তাকেই বিয়ে করে বসলো। গোপনে। বিয়ের পর দেখলো ঘরে বসেই পিতার ব্যবসা দেখে। রুমাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। তার পোশাক আশাক থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলো প্রশংসা আর সহায়তার নামে। রুমা এক সময় দেখলো সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার মডেলিং জগৎ থেকে। সে হারিয়ে যায় আর একজনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে। সব স্বপ্ন মুছে কাজ হলো শুধু প্রেম! সত্তাহীন এক অস্তিত্ব। দম বন্ধ হয়ে এলো। এরপর শুরু হলো ঝগড়া বিবাদ। প্রতিদিন। বছর খানেকের মধ্যে রুমা ফিরে এলো বাবার বাড়িতে।

রুমার বক্তব্য, সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। প্রিন্স এখন বলে, দাঁড়াও নিজের মতো করে, আমার আপত্তি নেই। রুমার আছে। রুমা বলেছে, না, আগে আমি

আফসানা মিমি

একাই নিজের পরিচয়ে দাঁড়াবো। তারপর ফিরে আসবো পরিস্থিতি বুঝে।

প্রিন্সের সঙ্গে সে একটি চুক্তি করেছে। দেড় বছর দু'জন ভিন্ন থাকবে। এর মধ্যে রুমা নিজের পুরনো অবস্থানে ফেরত যাবে অভিনয় এবং মডেলিংয়ে। এ সময় প্রিন্স তাকে কোনোভাবে ডিসটার্ব করবে না। দেড় বছর পর দু'জন সিদ্ধান্ত নেবে তারা এক সঙ্গে থাকবে কিনা।

প্রিন্স সব মেনে নিয়েছে। ছয় মাস হলো প্রিন্স ফোনে খোঁজ খবর রাখে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রুমার বক্তব্য হলো, প্রিন্স আর আমার মধ্যে একজন নারী পুরুষ হিসেবে বসবাসে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখানে আত্মসত্তা বিলুপ্ত করে থাকতে হবে। যা আমি চাচ্ছি না।

রুমা বৈভব ছেড়ে একটু সুন্দর সম্পর্ক বাঁচাতে এবং বাঁচতে নিজের মতো করে একক জীবন বেছে নিয়েছে। রুমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হলো একটি চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরিতে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। যদিও রুমার সঙ্গে রয়েছে তার পরিবার। এবং ফেরার পথ বন্ধ করেনি। তবু একটা কথা স্পষ্ট আত্মপরিচয়ের জন্য একটি মেয়েকে একক যুদ্ধেই লড়তে হয়।

আমাদের অসংখ্য চিঠির মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জুড়ে আছেন আফসানা মিমি। তিনি অভিনেত্রী নির্মাতা। একটি সংস্থার প্রধান। তিনি অনামিকাকে বুঝতে চেয়েছেন, সমাজের মানুষদেরও ব্যাখ্যা করেছেন মানবিক বিচারে। তার মতামত দিয়েই শুরু করা যাক :

নগরজীবন মানেই বাঁচার লড়াই

'নগরে নারীর একক জীবন' এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য রয়েছে। নগরে শুধু নারীর কেন, পুরুষের কি একক জীবন নয়? এমনকি পরিবারও একক। নগর মানেই একক সত্তায় টিকে থাকার জন্য সংগ্রামই মুখ্য এই জীবনে। এখানে নারী-পুরুষ প্রত্যেকে নিজস্ব পথে যুদ্ধ করছে টিকে থাকতে। এর আরও অনেক রকম ব্যাখ্যা আমার আছে। সেদিকে যেতে চাই না। আমি ভাবি শিরোনামটা 'নগরে নাগরিক বা মানুষের একক জীবন' হলে কেমন হতো?

অনামিকার চিঠি আমি পড়েছি। ভেতরে আলোড়িত আর আন্দোলিত হয়েছি। অনামিকার জন্য খারাপ লেগেছে, সহমর্মিতা জেগেছে। তার সাহস মুগ্ধ করেছে। যদিও তার চেয়ে সাহসের কাজ আরও অনেকেই করছে। অনামিকা ৮টি পয়েন্টে যন্ত্রণা আর বেদনার কথা তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। আমিও মনে করি এই সমস্যা সকল নারীর। আমারও। আমার মতো অন্য অনেকের। সমস্যাটা যতটা না ব্যক্তির তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাজনৈতিক। অনামিকার চিঠির এই একটা দিক। অন্যদিকে তার লড়াই। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। অনামিকা সমস্যা নিয়ে যতো আলোচনা করেছে তার চেয়ে আমি অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি অনামিকার দায়িত্ববোধ আর সামনে এগিয়ে যাবার সাহসকে।

অনামিকার চিঠি শেষ হতেই ভাবছিলাম, বিষয়টা নিয়ে কিছু একটা লিখবো। কি লিখবো সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছু একটা না লিখে শান্তি পাচ্ছি না। ভাবতে ভাবতেই রবি ঠাকুরের স্ত্রীরপত্রের মেজবউ মৃণালের কথা মনে পড়ে গেলো। মৃণালও আমাদেরই একজন। হৈমন্তী, বিলাসী আরও অন্য অনেকের কথা বলা যায়। যদিও মৃণালদের চেয়ে আমরা এখন অনেক সাহসী আর সচেতন। তবুও কোথাও কোথাও মৃণাল আর আমরা একই। নারী বলেই তার বঞ্চনা-এটা মেনে নিয়েছে। পরিবারে থেকেছে। অভিমানী মন বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। বাস্তবে সম্ভব হয়নি। পরিবারের মধ্যে থেকে সে সমস্যাটা এড়াতে বা মুখোমুখি হতে সাহস পায়নি। পরে মৃণালিনী ঐ পরিবার ছেড়ে চলে যায়। একটা পত্র লিখে যায়। এই পত্রই হলো তার প্রথম বিদ্রোহের প্রকাশ। এই পত্রে কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। মৃণালের জন্য কেউ দুঃখবোধ করেনি। আমি বা মৃণাল বা অনামিকা আমাদের লেখায় কিছু হবে না, জানি। কিন্তু কারও কারও ভাবনায় যদি এই লেখা আঘাত হানে! সময়ের ব্যবধানে মৃণাল জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, আর আমরা জায়গা ধরে রাখার চেষ্টায় আছি। কোথাও কোথাও সফলও। হ্যাঁ, অনামিকার মতো সব সমস্যা ফেস করেই সফল। প্রথমে শিরোনামের কথা তুলেছি। অনামিকার কণ্ঠেই আমার জানতে ইচ্ছা করছে নগরে নারীর যৌথ জীবন কি খুব আলাদা এর থেকে? যৌথ জীবনে কি স্বামীর বন্ধু, অফিসের কলিগ, পাশের ফ্ল্যাটের তাগড়া যুবক আমার দিকে অন্যভাবে তাকাচ্ছে না, আকাঙ্ক্ষা করছে না, চোখে মুখে নারীর প্রতি লোভের ভাষা ফুটে ওঠে না? বা যৌথ জীবনেও কি পরিবারের অন্য কেউ (ভাসুর, দেবর, এমনকি স্বামী পর্যন্ত) আকাঙ্ক্ষার হাত বাড়ায় না? আসলে একক জীবনের আগেও যে জীবন আছে সেটাও নারীর সংকট। নারী কোথাও সংকটমুক্ত নয়। আমি তো মনেই করি, বাংলাদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া নারীর সঙ্গে উন্নত বিশ্বের মডার্ন মেয়েটির কোনো পার্থক্য নেই। তার হয়তো খাওয়া-পরা নিয়ে চিন্তা নেই। সামাজিক নিরাপত্তা আছে। কিন্তু সমস্যাগুলোর গতি প্রকৃতি শুধু স্থান কাল ভেদে পরিবর্তিত হচ্ছে। ওরা প্রতি আঘাত করতে পারে।

অনামিকার যুদ্ধ যথেষ্ট সাহসের পরিচয় বহন করে। যদিও তার লেখাটি হতাশার জায়গা থেকে। আমি জানি মানুষের সবগুলো বোধই কোনো না কোনো সময় ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোড়িত করে। সাহসী আর দায়িত্বশীল অনামিকার পাশে হতাশায় মুষড়ে পড়া কাউকে আমি পছন্দ করছি না। আমি নারীবাদী নই। তবে নারী হিসেবে নারীর ক্রাইসিসগুলো বুঝি। যেটা নারীবাদী হবার জন্য নয় বরং পিতৃতন্ত্রকে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবো বলে। অনামিকা একা বাসা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আমি জানি একলা বাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে নগরে নারী-পুরুষ উভয়ের সংকটই সমান। কারণ সমাজ একলা বসবাসকে অনুমোদন দিচ্ছে না। আমার অনেক বন্ধুকে জানি যাদের একটা বাসা নিয়ে থাকার সামর্থ্য আছে। কিন্তু বাসা পাচ্ছে না 'ব্যাচেলর' বলে। একটা ছেলের সামাজিক কিছু সুবিধা আছে সত্য। তারপরও সেই সুবিধা ভোগ করে তারা একা থাকতে পারছে না। সংঘবদ্ধভাবে থাকতে হচ্ছে। তেমন মেয়েরা থাকছে হোস্টেল, মেস করে। তুলনায় নারী কম। কিন্তু থাকছে। অর্থাৎ সমাজ নারী-পুরুষ উভয়কে যৌথ বা পরিবারের মধ্যে বসবাসকে সমর্থন দিচ্ছে। একক সত্তা বলে কিছু থাকছে না। প্রকৃতিগতভাবেই নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার হাত বাড়াবে। কিন্তু সামাজিক বিধান নারীকে করেছে সংকুচিত। এটা হলো নারীর নিজস্ব সমস্যা। আকাঙ্ক্ষার হাত ধরবে কি ধরবে না সেটাও নারীর ইচ্ছা। কেউ হাত বাড়ানোর ভঙ্গি করলেই তাকে আমি দোষ দিতে রাজি নই। কারণ এই হাত বাড়ানোর ভঙ্গিটা সে হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে লালন করে আসছে। আর নারী তার নিজস্বতা বা প্রতিবাদের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে শুরু করেছে শত বছরেরও কম সময়। অনামিকাকে নারীর প্রতিনিধি বা কণ্ঠস্বর ধরে নিলে, তার তোলা প্রশ্নগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক সামনে আসে। একজন নারী হয়েও আমি তা বলছি। বিতর্ক মানে অনামিকা আর আমার নয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে- এটা হবেই। আমরা সমাজের অন্তর্গত, বহির্ভূত নই। নারী-পুরুষ সকলেই।

জমিলা, দীর্ঘদিন ধরে আমাকে সহযোগিতা করে আসছে। মিমি হয়ে ওঠার পেছনে ওর অবদান অনেক। দু'জনেই আমরা নারী। ভেবে দেখেছি, দু'জনের মধ্যে কোনো

পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু প্রেক্ষাপটে। জমিলার সংসার আছে। সন্তান আছে। স্বামী আছে। আমার অন্য কিছু নেই। আছে কর্মব্যস্ততা। প্রতিদিন সকালে মালিবাগ থেকে বাসে করে জমিলা বাসায় আসে। ফিরতে ফিরতে কোনোদিন তার রাত হয়ে যায়। রাত ১০টার পরে হলে তাকে ট্রান্সপোর্ট দিই। তার আগে হলে তাকে বাসেই ফিরতে হয়। জমিলার মতো আমিও কাজে বেরোই। আমার গাড়ি আছে বা ট্যাক্সি ভাড়া করতে পারি। আমাকে জমিলার মত বাসে হুড়োহুড়ি করে যেতে হয় না। তারপরও দু'জনের লক্ষ্যই এক এবং অভিন্ন প্রায়। দু'জনেরই প্রথম লক্ষ্য আয় করা এবং টিকে থাকা। প্রশ্ন হচ্ছে, জমিলা বাসে আসা-যাওয়ার পথে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় বা হয় না। হলেও শেয়ার করে না আমার সঙ্গে। সবকিছু পেছনে মাড়িয়ে তাকে কাজে আসতেই হয়। কেন? জমিলা বা আমাকে কাজ করতে হয় প্রয়োজনীয়তার তাগিদে। স্বপ্ন পূরণের তাগিদে। জমিলা কাজ করে দরিদ্রতা দূর আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, আমি কাজ করি মানুষ হিসেবে নিজেকে জাস্টিফাই করতে। হতে পারে জমিলাকে আমরা ভালো পরিবেশ দিই, কিন্তু সে যতক্ষণ রাস্তায় থাকে? আমরা প্রত্যেকেই জানি সময় কারো ইচ্ছা মতো চলে না। বাসে যখন একজন পুরুষ আকাঙ্ক্ষার হাত দিয়ে কোনো নারীকে স্পর্শ করে বা করতে চায়, তখন নারীর মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। এর প্রতিবাদ কিন্তু আরেকজন পুরুষই করে। হতে পারে পুরুষটি বাসে অন্যদের সামনে নিজের পৌরুষত্ব দেখাতে একটা লোভী হাত থেকে নারীকে রক্ষা করে। আমি বলছি না নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পুরুষ যেমন সমাজে শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে। নারী সেটা পারেনি। যদিও আমি বিশ্বাস করি পারবে। যে জন্য এখনো বিকৃত পুরুষ হাত একটি অন্যটি সহায়ক হাত। এই তফাৎটা করতে হবে। জমিলা এর মধ্যদিয়ে কাজে আসছে, উপার্জন করছে, সংসার টিকিয়ে রাখছে আর দায়িত্ব পালন করছে। আমি মনে করি জমিলার তুলনায় আমার যুদ্ধ অনেক সহজ। কারণ আমার ন্যূনতম আহার বা বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। জমিলার মতো পরিবারে আমাকে জবাবদিহি করতে হয় না। অন্যদের চোখে আমি সফল মানুষ, আমার চোখে জমিলা আরও সফল। কিন্তু নারী হিসেবে আমরা দু'জনই দুই প্রেক্ষাপটে একই রকম সমস্যা ফেস করি। বাংলাদেশে আমি, আমেরিকায় জুলিয়া রবার্টস বা অন্য x, y, z সবাই।

অনামিকা গার্মেন্টসের মেয়েদের নিরাপত্তার কথা তুলেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে নারী কোথায় নিরাপদ? ঘরে, সংসারে, সমাজে বা নিজের ভুবনে? উদাহরণ হিসেবে শাজনীনের কথা বলতে পারি। শাজনীনের মতো পারিবারিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের কয়টা মেয়ের ছিল? কিন্তু নিরাপদ এ পারিবারিক গন্ডির মধ্যে শিশু শাজনীন কি হায়েনার শিকার হয়নি? তিন্নি সফল মডেল। সফলতাই তাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়। তিন্নি, মিমির সঙ্গে গ্রামের অবহেলিত আমেনা, রহিমার পার্থক্য কোথায়? কোথায় তারা নিরাপদ? শুধু নারীর নিরাপত্তা কেন? নারী-পুরুষ কেউ কি নিরাপদ? পত্রিকা খুললে কি প্রতিদিন অনেক পুরুষের হত্যা, লাঞ্ছিত হবার ঘটনা পড়ছি না? অনামিকা, সাধারণ বা অসাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে পুরুষ। কিন্তু পুরুষের নিরাপত্তা কি পুরুষের হাতে বিঘ্নিত হচ্ছে না। অনামিকার তোলা নিরাপত্তার ব্যাপারটি আমি দেখি সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরুষ নয়, দানবীয় শক্তির সঙ্গে মানুষের লড়াই। মূল্যবোধ যত কমে যাচ্ছে সমাজে, রাজনীতির যত দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে, ততই নগর কি গ্রামের নারী-পুরুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠছে দানবীয় শক্তির কাছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আর রাজনীতির সুশীলিকরণ ছাড়া এই বৃত্তের বাইরে আমরা কিভাবে হাঁটবো অনামিকা?

অনামিকার চিঠির মূল ব্যাপার হলো যে পুরো সামাজিক কাঠামো ধরে টান দিয়েছে। তার উথাপিত প্রশ্ন আমার ভেতরে আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যার উত্তর আমার মতো অধিকাংশ নারী-পুরুষের অজানা। ঠান্ডা মাথায় ভাবলে এর কোনো স্থায়ী সমাধান আসে না। ক্ষণস্থায়ী, অস্পষ্ট কিছু ব্যাপার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনামিকার চিঠি পড়তে গিয়ে বারবারই আমার নারী অধিকার নিয়ে হৈ চৈ করার কথা মনে এসেছে। আমি ভেবেছি- নারী অধিকার ব্যাপারটি কি? অধিকার আমরা কার কাছে চাই? পুরুষ না রাষ্ট্রের? নারী অধিকার ব্যাপারটি তো কোনো ইনস্টিটিউশন নয় যে, আন্দোলন করলাম আর পেয়ে গেলাম। আমি যতটুকু বুঝি নারীরা তার অধিকার পুরুষের কাছেই চায়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ হিসেবে পুরুষকে সামনে দাঁড় করাচ্ছি। এতে পুরুষের যদি অধিকার দেবার ক্ষমতা থাকে আর দেয়ও, তাতেও কি অনামিকার উথাপিত প্রশ্নের উত্তর মিলবে? আমি মনে করি না নারী অধিকার এই সংগ্রামে পাওয়া যাবে। কেন?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে অনামিকার উথাপিত প্রশ্নগুলো অনেক বেশি দৃশ্যমান। এর গভীরে আরও প্রবেশ করা দরকার। সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ না করলে অনেক কিছুই দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যাবে। সমাজ বিজ্ঞানী নই আমি। আমি আফসানা মিমি, নাটক করে প্রোডাকশন বানিয়ে খাই। নাটকের কোনো চরিত্রে যখন অভিনয় করি তখন মানব জীবনের কোনো না কোনো সমস্যার মাঝ দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। অর্থাৎ সামাজিক জীবন প্রণালী নাটকে উঠে আসে। আমি অনেক পড়াশুনা করিনি। নিজের জীবনের উপলব্ধি আর পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করি। এখানে আমি মানুষ, নারী নই। অনামিকা আমার বোন বা বন্ধু। বা আফসানা মিমিই অনামিকা। অনামিকার চিঠি আমাকে সবকিছুই নতুন করে ভাবায়। যতটুকু জানি আদিম সমাজ ব্যবস্থা ছিলো মাতৃত্বতান্ত্রিক। তারপর সমাজ পুরুষতান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত হয়েছে। যখন সমাজে সম্পত্তির ধারণার উদ্ভব হলো তখন থেকেই পুরুষতান্ত্রিকতা শুরু। গায়ের জোরে বলীয়ান নারীর কাছ থেকে সে ক্ষমতা কেড়ে নিলো। নারী হয়ে গেলো পুরুষের সম্পত্তি। এক এক খন্ড জমি দখলের মতো, এক একজন পুরুষ বললো এই নারী আমার, এটা তোমার। অর্থাৎ নারী হয়ে গেলো সম্পত্তি। এতে সেই সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ায় আসলো বিবাহ প্রথা। বিবাহ প্রথাও নারীকে নিরাপত্তা দেয় না। বিয়ের রাতে স্বামীর কাছে অনেক নারী কি ধর্ষিত হয় না? বিবাহিত নারী কতটা একক এবং নিঃসঙ্গ কখনো কি ভেবে দেখেছি আমরা? আপনার চারপাশেই এমন অনেক উদাহরণ পাবেন। আবার অনেক বিবাহিত পুরুষও কি ভীষণ একা নয়? এখন এই পুরুষ যদি নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে? অনামিকা, তাহলে আমরা কি বলবো?

এখান থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে প্রয়োজন নারীর মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন। শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও। মূল্যায়ন কে করবে? সমাজের মধ্যে প্রাথমিক ও প্রধান প্রতিষ্ঠান পরিবার। ব্যাপারটা এমন হলে অনামিকার প্রশ্ন তোলার জায়গা থাকে না। আমার প্রতিক্রিয়া লেখার দরকার হয় না। কিন্তু হয়নি বা হচ্ছে না। কেন? পরিবার নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করছে না। কেন? উত্তর খুঁজলে মৌলিক অধিকারগুলোর কথা আসবে। শিক্ষা তার একটি। মেয়ে বড় হলে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। এটা খুবই সত্যি ধারণা। হাজার হাজার বছরের প্রথা এটি। তাই বাবা মেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছে না। অর্থাৎ পারিবারিক কাঠামোয় বৈষম্য বিরাজমান। যদিও আমি পারিবারিক বৈষম্যের শিকার হইনি। কারণ আমরা দু'বোন। কিন্তু বহু পরিবারকে আমরা জানি। পরিবার ছেলের পেছনে লাখ লাখ টাকা লগ্নি করে। ছেলে ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখাশোনা করবে এই আশায়। যদিও এই ধারণায় কাঠামোগত

না হলেও ভাসা ভাসা কিছু পরিবর্তন আসছে। কিন্তু বৈষম্যের বীজ তো পরিবার থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে না। এই বৈষম্য তো আমাদের অস্থিমজ্জায়, রক্তে। আমি বা অনামিকা 'মা' হলে ছেলে সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছি। কারণ ভবিষ্যতের নিরাপত্তাহীনতা। মানে হলো নারী নিজেও কিন্তু এই বৈষম্যের অংশীদার। আমরা মনে করছি নারী দিনের আলোয় নিরাপদ। রাতে রাস্তায় যখন কাজ হয় তখন হাজার হাজার নারী শ্রমিক কাজ করে, পুরুষের পাশাপাশি। দৃশ্যটা অভিভূত করার মতো। বাস্তবতা হলো এই নারী শ্রমিকের বেতন কম। তাই তার চাহিদা বেশি। আমি বলতে চাচ্ছি পুঁজির সঙ্গেও নারীর অধিকার আর মুক্তির প্রশ্নটি জড়িত। পুঁজিপতি কম টাকায় কাজ সারতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিশ্রম উভয়েরই সমান। এই বৈষম্য কিন্তু নারী নিজেও মানছে। কারণ তার শিক্ষা আর সচেতনতার অভাব। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে শ্রম শোষণ আর পুঁজির বিকাশ। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই বৈষম্য যেমন নারী আর পুরুষের, পাশাপাশি পুরুষ আর পুঁজির। এই বৈষম্য সমাজ, রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নারী অধিকার নিয়ে প্রচুর কথা বলা হয়। আমরা কি বলি নারীর জন্য বাস উঠিয়ে দাও। বাস-ট্রেনে নারীর রিজার্ভ সিট দরকার নেই। পার্লামেন্টে পুতুলের ভূমিকা পালন করা সংরক্ষিত আসন তুলে দাও। নারীর প্রতিপক্ষ যদি পুরুষ হয় তবে প্রতিযোগিতা করে আসুক। এতে প্রথমাবস্থায় কাঙ্ক্ষিত ফল না পেলেও নারী-পুরুষের মতো সমাজে কাঠামোগত একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। সেটাও সম্ভব হলে জীবনের কাছে নত হয়ে অনামিকাকে এই প্রশ্নগুলো তুলতে হবে না। আমি পুরুষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে রাজি নই। তেমনি পুরুষও নারীকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করুক আমি চাই না। সভ্যতা আর জীবনের বিকাশে আমরা একে অপরের পরিপূরক- বিষয়টিকে এভাবেই দেখি। অনামিকা, আমি বহু পুরুষকে জানি যারা নারীকে সম্মানের সঙ্গে দেখে। আবার অনেক নারীকে চিনি যারা নারীদের অসম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করে। এই ব্যাপারগুলো আমরা পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার হিসেবে বহন করে আসছি। পৃথিবীর কোনো কোনো সমাজ এই উত্তরাধিকার থেকে বেরোতে পেরেছে, আমরা পারিনি। তাই আমাদের যন্ত্রণা আর অপমান বোধ তীব্র। আমি লক্ষ্য করেছি যে পরিবারে মায়েরা চাকরি করেন সেই পরিবারের সন্তানেরা মেয়েদের অনেক বেশি সম্মান করে। অর্থাৎ নারীর কাজের স্বাধীনতা মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন ফেলে। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষের শৃঙ্খল পরে আছি। এটা একদিনে পরিবর্তন হবে না। আমি আফসানা মিমি হবার পেছনে অনেক পুরুষের সহযোগিতা আছে। যে অনামিকা সাপ্তাহিক ২০০০-এ পত্র লিখেছে, তার এই বোধ তৈরির পেছনেও একাধিক পুরুষের সমর্থন আর সহযোগিতা আছে। আমি বিশ্বাস করি তাই আলাদা করে বিবেচনা করবো? উভয়ের পরিচয় মানুষ। এখানে লড়াইটা সুরের সঙ্গে অসুরের। দানবের সঙ্গে মানবিকতার।

আমি মনে করি বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা একটা সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। মানুষের প্রতি অনাচার বিশ্বের কোথায় কম হচ্ছে? বিশ্ব যত ভোগবাদের দিকে এগুচ্ছে মানুষ তত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। অনামিকার, নারীর তীব্র যন্ত্রণা আর কষ্টগুলো প্রকট হয়ে উঠছে। নারীর মতো দুর্বল পুরুষ বা রাষ্ট্রের অসহায়ত্বও ফুটে উঠছে তীব্রভাবে। ভোগবাদ যদি হয় সম্পদের ওপর অধিকার, তাহলে প্রত্যেকেই এক একটা জিনিস নিজের বলে দাবি করছে। হাতের মুঠোয় সেটি না পেলে আমরা হিংস্র হয়ে উঠছি।

নগরে নারীর একক জীবন মূল সমস্যা নয়। আমরা একটি চেইনের মাঝে আছি। অনেকগুলো ধাপের মাঝামাঝি একটা ধাপ হলো একক জীবন। একটা মালার অনেকগুলো পুঁতি থাকে। মালাকে বদলাতে হলে একটা পুঁতি পরিবর্তন করলে হবে? সবগুলো পুঁতি পরিবর্তন করলে নতুন আরেকটা মালা হবে। নতুন ব্যবস্থায়ও হয়তো অন্য ফর্মে অন্য কোনো সংকট থাকবে। আমার কাছে বিষয়গুলো এরকম। তার মানে এই নয় যে অনামিকা আপনার প্রতি আমার সহমর্মিতা থাকছে না। অবশ্যই তা থাকছে। কারণ আপনার সমস্যা আমাদের সকলের। আমি শুধু পুরুষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাই না। তা দেখিয়ে কারো করুণাও পেতে চাই না। পুরুষকে পেতে চাই সহযোগী হিসেবে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। আবার এও চাই না অনামিকার ক্রাইসিস দেখে কেউ করুণা করুক। অনামিকার সংগ্রাম যেহেতু সকল নারীর, তাই অনামিকা নিজ শক্তি আর সাহসে সামনে চলুক এটাই চাইবো। আমি একা যুদ্ধ করে এখানে আসিনি। অনামিকার যুদ্ধেও অনেকের সহযোগিতা থাকবে। যেটা বন্ধুর, সহমর্মীর। সে পুরুষ বা নারী যেই হোক, তাকে নিয়েই সামনে আগানোর পক্ষে আমি।

অনামিকার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা আমার। ভোগবাদের সময়ে সে ত্যাগ করছে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে। পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হলুদ শাড়ি পরা হয়নি। অনামিকা বিয়ে সম্পর্কে 'তালিমারা' শব্দটি ব্যবহার করেছে। শব্দটির সঙ্গে একমত নই। আমাদের অনেকের ভাই-ই পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শেরওয়ানি পরার কথা ভুলে গেছে। চারপাশে এমন প্রচুর উদাহরণ আছে। বিয়ে প্রথায় আমি বিশ্বাসী। জীবনের পূর্ণতায় নারী-পুরুষ উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। একটা ছাড়া অন্যটা পূর্ণতা পায় না। তাই 'তালিমারা বিবাহিত জীবন' শব্দটি মেনে নিয়ে বিবাহ প্রথা বা মাতৃত্বকে খাটো করতে চাই না। নারী একটি শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখাতে পারে। এখন বিবাহিত জীবনে আস্থা না থাকলে সভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা থাকবে কোথায়? পুরুষই বা কোন নির্বাসনে যাবে?

কোনো অফিসে নারীকে যদি পুরুষ সহকর্মী উত্যক্ত করে, তবে সেখানে মেয়েটির কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। চাকরিজীবী মহিলা যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রতিকার চায় তবে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। এক. তার কাজ করা আরও দুরূহ হয়ে পড়বে, দুই. প্রতিকার পাবে। কিন্তু মেয়েরা কাজ করছে। যার মানে দাঁড়ায় কাজ করার মতো পরিবেশ আছে। তা না হলে এতো মেয়ে কাজ করছে কিভাবে? আমি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা দিয়ে পুরো ব্যাপার বিচার করবো না। প্রসঙ্গটির অবতারণা এজন্য যে, অনামিকার চিঠি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলাদেশের নারীরা তখন অর্গল ভাঙছে। নিজেদের তৈরি করছে। সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে 'সম্পর্ক' একটা ব্যাপার। সম্পর্কের ধারণাটি বেশ জটিল। নারী-পুরুষের সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করে দেয় সমাজ ও পরিবার। এখন কোনো পুরুষের যদি কোনো নারীকে ভালো লাগে, সেটা তার অপরাধ নয়। ঘরে বউ থাকার পরও এখানে নিজেকে চেক করে মানুষ প্রমাণ করে সে মানুষ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, নারীর ক্ষেত্রে কি একই ঘটনা ঘটছে না? অবশ্যই ঘটছে। আমার পরিচিত অনেকেই আছে যারা নির্দিষ্ট কোনো পুরুষকে কামনা করে। সে চোখে ভালোবাসা যতটা, কামনাও ততটা থাকে। এখনকার নারীরা অনেকেই ছেলে বন্ধুদের প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ অগ্রসর হচ্ছে। অনামিকা যে সমাজের ভেতর থেকে এই পত্র লিখছে সেই সমাজেরই আলাদা চিত্র এটি। এর ব্যাখ্যা কি? মানুষের মন বড় বিচিত্র।

আমার কাছে শেষ বিষয়টি হচ্ছে শরীর। পুরুষের লোভী হাত, চোখের গন্তব্য হলো নারীর শরীর। শারীরিকভাবে নারী ও পুরুষকে পৃথক করে দিয়েছে প্রকৃতি। নারীকে মহিয়সী করে তুলেছেও প্রকৃতি। নারীর চোখে তার শরীর বড় পবিত্র জিনিস। পুরুষের কাছেও তাই। অন্তত তাই হওয়া উচিত। কারণ দু'জনের সম্পর্ক সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। নারীর প্রতি পুরুষের বা পুরুষের প্রতি নারীর আকাঙ্ক্ষা, এটা তো বেসিক।

বিয়ে একটি সামাজিক বন্ধন। কিন্তু বন্ধুত্ব কি ব্যক্তি বন্ধন নয়? বন্ধুত্বেও এই বেসিক বিষয়টি ছন্দময় করতে পারে। সেটা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। ভালো বিয়ে মানে অন্যের ওপর নির্ভর হয়ে থাকতে পারবে মেয়ে।

আমি মানি পরিবারের মেয়েটি বিয়ের কথা বেশি ভাবে। কারণ তাকে ঐভাবে বড় করে তোলা হয়। যেনো বিয়ে ছাড়া অন্য কিছুতে মুক্তি নেই। পারিবারিকভাবে যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়, তবে নারীর শরীর পরিবারের মেয়েটির কাছে সমস্যা মনে হবে না। আমি চাই পরিবারগুলো ছেলে-মেয়েদের ভাবনাগুলোকে স্বীকার করতে শিখুক। তাহলে নারী/পুরুষ নিজেদের সহযাত্রী হিসেবে দেখতে শিখবে। কোনো পুরুষ বা নারীর লোভের আগুনে মরতে হবে না কাউকে। একটা ছেলে-মেয়ে কোথাও নিরিবিলি কাটাতে পারছে না। নিজেরা পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারছে না। ফলে তারা সাইবার ক্যাফের মতো খুপচি ঘরে যাচ্ছে। যে স্পর্শ স্বাভাবিক সেটা করতে গিয়ে অপরাধ করে ফেলছে। অপরিণত বয়সে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হচ্ছে। একটা সময় ছেলে-মেয়ে উভয়েই ভাবছে তারা পরস্পরের দ্বারা নির্যাতিত। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করছে সমাজ আর ফতোয়াবাজরা। কিন্তু বাবা-মা যদি সন্তানদের নিরিবিলি সময় কাটানো আর বয়সের স্বাভাবিক প্রবণতাকে মেনে নেয় তবে অনামিকা যে অনাচারের শিকার তা কমে যাবে। দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসবে। আমার ধারণা স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বাভাবিকভাবে দেখলে বিষয়গুলো সহজ হয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা মেনে নেয়াই প্রয়োজন। এতে করে কোনো নারী ভাববে না শুধু আগ্রাসী একটি হাত তার দিকে উদ্যত থাবা নিয়ে বসে আছে। সেটা বন্ধুর হাতও তো হতে পারে।

আসলে বিষয়গুলো আমার কাছে যৌক্তিক আর অযৌক্তিক। ভীষণ জটিল। আমি চিন্তা করি মানুষের মূল্যবোধে থাকবে সততা আর স্বচ্ছতা। মানুষ যদি তার সীমাবদ্ধ চিন্তার জায়গা থেকে বেরোতে পারে, তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমার যেমন মনে হয় নারীর কিছু সমস্যা আসলে নিজস্ব। শারীরিক নয় মানসিক। দেশে অধিকাংশ গৃহবধূ, তাদের কোনো কাজ নেই। ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। ফলে তাদের ভাবনার স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ। এজন্য তারা সাহসীও হতে পারে না। সরকার আর রাষ্ট্র যদি দারিদ্র্যমুক্ত আর সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে তবেই নারীর মুক্তি। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন না হলে অনামিকারা এমনই আত্মবলির অভিযোগ করবে। এ কাজে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে বলে আমার ধারণা।

অনামিকার মতো শুধু নারীর চোখে একক জীবন দেখা অসম্পূর্ণ মনে হয় আমার। তারপরও অনামিকাকে স্যালুট। তিনি কোথাও নারী অধিকার আর লিঙ্গের সাম্য নিয়ে চিল্লাচিল্লি করেননি। মানুষ হিসেবে তার ভাবনাগুলোকে আমাদের মাঝে উস্কে দিতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে?

আফসানা মিমি
অভিনেত্রী, নির্মাতা
বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালক

একই ঘটনা আগে ও পরে

'নগরে নারীর একক জীবন' প্রচ্ছদ কাহিনীটি পড়ে পর পর দু'রাত নির্ঘুম কেটেছে। দু'চোখের পাতা এক হয় না। কত অসম্মানজনক পরিস্থিতি, ভীতিকর পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে মনের প্রতিটি কোনায়। শত শত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা নয়, যেন টিকে থাকা। যে এরকম কঠিন সংগ্রাম করে জীবন পার করেছে, শুধু সে-ই বোঝে এ যন্ত্রণাময় কষ্ট কী? কাহিনীটি পড়ে মনে হয়েছে প্রতিটি লাইন, শব্দ, অক্ষর যেন আমারই।

১৯৮২ সালে নিজ জেলা বগুড়া থেকে রাজশাহী বিভাগের সবচেয়ে দূরবর্তী জেলা দিনাজপুরে প্রথম বদলি হই। তখন আমার বয়স ২৩/২৪। তখনকার প্রেক্ষাপট চিন্তা করুন। সেই থেকে শুরু হয়েছিল আমার একক জীবনের কঠিন সংগ্রাম। অনামিকা যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে আমি একশ' ভাগ একমত।

কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার যৌন হয়রানি এবং কিছু অসভ্য সহকর্মীর দ্বারা উত্ত্যক্ত হওয়ার প্রসঙ্গটি এখানে বাদ রাখলাম। কারণ যেকোনো কর্মজীবী নারীই এর শিকার হতে পারে। তাছাড়া কোনটা রেখে কোনটা গুছিয়ে লিখব সেটিও একটি ব্যাপার। এখানে মাত্র দুটো অন্য অভিজ্ঞতা লিখছি। আমার যে চাকরি সেখানে কনিষ্ঠরা জ্যেষ্ঠকে স্যালুট করার নিয়ম আছে। ১৯৭৮ সালে যোগদানের পর লক্ষ্য করলাম কনিষ্ঠ, সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন নির্বিশেষে আমাকে একজন মেয়ে হিসেবে দেখছে- কর্মকর্তা হিসেবে যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও সমআচরণ করছে না। যথা সময়ে পাওনা স্যালুট একেবারেই উঠছে না। বিধিটা হচ্ছে, স্যালুট পায় পদবী, ব্যক্তি নয়। আমি সামনে আছি অথচ একটু পেছনে আমার চেয়ে ২/৩ ধাপ কনিষ্ঠ পুরুষকে যথাযথ স্যালুট করলো, আমাকে নয়। গভীর দুঃখের সঙ্গে আরও খেয়াল করলাম, এতে আমার অন্য মহিলা সহকর্মীরা কিছুই মনে করছে না, যেন এটাই স্বাভাবিক। আমি নানাভাবে এর প্রতিবাদ করা শুরু করলাম। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নিলাম। কোনো প্রতিকার তো হয়-ই না বরং বিভিন্ন লেভেলে রসিকতার শিকার হই। 'আমি নাকি বাড়াবাড়ি করছি।' একজন ঊর্ধ্বতন পুরুষ কর্মকর্তার মন্তব্য 'মেয়েদের আবার স্যালুট করতে হবে কেন?' এখন অবশ্য বিষয়টি প্রায় ৮০ ভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময় লেগেছে প্রায় ১৫/১৬ বছর।

এটা ১৯৯৫ সালের ঘটনা। আমার পোস্টিং তখন নওগাঁ জেলায়। বাসা বদল করেছি। মালামাল প্রায় সবই উঠে এসেছে। নতুন বাসায় ঢুকবো এমন সময় সদর দরজার কাছে পাশের বাড়ির একজন অপরিচিত মধ্যবয়স্ক মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আপনি একলা থাকবেন, বিয়ে হয়নি? আমি জবাব দিলাম, 'বিয়ে হয়নি নয় এখনো বিয়ে করিনি'। আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে মহিলা জবাব দিলেন, 'বিয়ে করেননি, না অন্য কিছু?' আমি ঐ বাসায় ৮ মাস ছিলাম, মহিলার সঙ্গে দ্বিতীয় আর কোনো দিন বাক্য বিনিময় করিনি।

অবশ্য এসবের বিপরীত দিকও আছে- কর্মক্ষেত্রে প্রচুর সহযোগিতার নজির আছে। সফল টিমওয়ার্কের জন্য অনেক সুনাম হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, ভালো পরিবেশে ভালো বাসা পাওয়া, বাসা বদল ইত্যাদিসহ প্রচুর ব্যক্তিগত কাজেও পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি অনেকেরই। এসব স্বীকার না করা শুধু অকৃতজ্ঞ হওয়া নয়, অপরাধও বটে। নিজের গুণ গাওয়া নয়- ভালো মানুষের ব্যক্তি ইমেজ অনেক সময় অনেক কাজে লেগেছে।

রাজনৈতিক পেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলার যে অবস্থা তাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, সেখানে একা একজন নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নটি অবান্তর। আমি যে বিষয়টির ওপর জোর দেব তা হচ্ছে, কোনো মানুষ সারা জীবন একা থাকতে পারে না। একা একা থাকা যায় না। এক সময় শত ব্যস্ততার মধ্যেও গভীর কষ্ট ও ক্লান্তি ভর করে। মনে হয় ঘরে তো কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই! একটা কথা বলার জন্য কোনো জনমানব নেই। ঘরে ফিরতে হয় বাইরে থাকা যায় না বলে।

অনেক আগে বিয়ে প্রসঙ্গে আমার মা

বলেছিলেন- তোমার দায়িত্ব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি প্রচন্ড রকম একা হয়ে যাবে। সত্যিই যখন কাঁধে দায়িত্ব ছিল তখন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একা একা থেকেছি। তেমন করে কখনও একাকিত্ব বোধ হয়নি। কিন্তু মায়ের এই সত্য কথাটা যে এতটা নিষ্ঠুর ও গ্লানিময় হবে তা বুঝিনি। এখন প্রিয় বিষয় পড়ালেখা করে সময় পার হয় ঠিকই কিন্তু নিঃসঙ্গতার অক্টোপাস গ্রাস করে রাখে। রাতটাকে দীর্ঘতর মনে হয়। নিজের জীবনটাকে খুব ভারী মনে হয়। বেঁচে থাকাটাই যেন অর্থহীন।

সে দিন আমার ছোট বোনের ১৮ বছরের মেয়ে বলছে, বড় খালামণি, তুমি একটা বাচ্চা অ্যাডপট্ করতে পারতে। সে এখন তোমার ভালো বন্ধু হতে পারতো। এই চিন্তাটা আমি সময় মতো করেছি। তখনকার আমার অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং পেশাগত কাজের চরিত্র এই চিন্তাটাকে বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। বর্তমানে সেই সমস্যাগুলো অনেকাংশে নেই। কিন্তু এখন আমার বয়স ও শরীর একটি শিশু প্রতি পালনের পক্ষে নয়। তাই যেসব নারী একক জীবন চালাতে চান তাদের পরামর্শ দেব সামর্থ্য এবং ইচ্ছা থাকলে সময়মতো 'শিশু দত্তক' নিতে। তাহলে জীবন সায়াহ্নে এসে আমার মতো অন্তত এ রকম কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

আসলে আমার অভিজ্ঞতা আরও বলে, পারিবারিক ও সামজিক বৈষম্য, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং একাধারে স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী ও আধুনিক ধ্যানধারণা সমৃদ্ধ একজন শিক্ষিত নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ বন্ধুত্বে হয়তো বৈচিত্র্য খুঁজে পায় কিন্তু বিয়ে করতে চায় না। পুরুষ ইগো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ সমাজের ৯৫ ভাগ পুরুষ স্ত্রীকে অধিকারের ভেতর রাখে। স্ত্রীর জ্ঞান ও চিন্তাধারা পুরুষের চেয়ে কম হলেই তাকে ডমিনেট করা সহজতর।

একক নারী হিসেবে এ সমাজে মান-সম্মান নিয়ে নিরুপদ্রবভাবে বসবাসের জন্য নিজের মন ও শরীরের চাহিদাকে প্রতিনিয়ত অবদমিত করে চলতে হয়। এই যে এখন, এই বয়সে (৪৫) একজন বিবাহিত পুরুষকে আমার খুব ভালো লাগে। প্রায় বছর তিনেক হলো তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তার স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গেও আমার খুব ভালো সম্পর্ক। সে আমার দুঃসময়ে পাশে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। যখন যে সহযোগিতা চেয়েছি সাধ্যানুযায়ী তা করে দিয়েছে। তার আচরণে আমি কোনো দিন লোভ বা স্বার্থ দেখিনি। তার চাকরি খুব মর্যাদাপূর্ণ, ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। ইচ্ছা থাকলেও আমাকে সময় দেবার কোনো সময় যেমন তার নেই, তেমনি তার পেশাগত কাজের গুরুত্ব, মর্যাদা এবং আমাদের পারিবারিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদিও অনুকূলে নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমার এতো দিনের চর্চা ও পরিচর্যায় সংযমী মনে চিড় ধরেছে। ইদানীং তার প্রতি আমি শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছি। এর কোনো ব্যাখ্যা বা সমাধান আছে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বন্ধু- চলো, ভাঙ্গি তবে এই অচলায়তন

নিজের ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। ঢাকার এক ব্যস্ততম এলাকা ফার্মগেটে ইন্দিরা রোডের মোড়ের ওভারব্রিজের কাছেই ঘটে ঘটনাটা। সুশ্রী, শালীন পোশাক পরিহিতা এক যুবতী হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ আমার বয়সী হবে একটা ছেলে, সে ছিল ক'জন বন্ধু পরিবেষ্টিত, বলে বসল, 'আপা আপনের ওড়না ঠিক করেন,... দেখা যাইতাছে,' তারপর অট্টহাসি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া মেয়েটির দ্রুত প্রস্থান। অনেকের মতোই একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমার নীরব পর্যবেক্ষণ!

আড়াই বছর প্রায় হবে ঘটনার বয়স। তখন আমি সদ্য এইচএসসি পাস করে ওমেকা'য় কোচিং করছি। ছেলেগুলো হয়তো কোনো কোচিংয়েই পড়ে। এখন হয়তো ভালো কোথাও ভর্তি হয়েছে, সেখানেও ভালো করছে, ভবিষ্যতে হয়তো ভালো কিছুই করবে। কিন্তু মেয়ে দেখলে অশ্লীল উক্তি করার মধ্য দিয়ে যে বিকৃত প্রবণতা প্রকাশ হয়ে গেল, তা কমার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো তার অবস্থান ও প্রেক্ষাপট বদলেছে। অনামিকা, আপনার একজন কলিগের কথা বলেছেন, তারও অতীত খুঁজলে এমন ঘটনা বোধকরি পাওয়া যাবে।

যে ছোট্ট ঘটনা দিয়ে আমি শুরু করেছি, সেই মেয়েটিও একা ছিল। তেমন মেয়ে ঢাকা শহরে তো বটেই, সবখানেই কমবেশি আছে। এখন অন্তত রাস্তাঘাটে একা একা অনেক মেয়েই বের হয়। এবং কত যে কথা শুনতে হয়!

'সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমাদের চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক প্রথা, দৃষ্টিভঙ্গিতে।' সম্পূর্ণ একমত আমি। তবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকৃতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থার। আমার মা'র কাছে শুনেছি, সকালে প্রাইভেট পড়তে যাওয়া দুটো মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে মধ্যবয়স্ক এক সাইকেল আরোহী। আজ খুলনায় রুমী আত্মহননে বাধ্য হয়েছে।

অথচ সমাজে এ ধরনের সন্ত্রাসী কয়জন? খুবই সামান্য। প্রতি একশ' জনে একজনও হয়তো নয়। তবে তাদের বিকৃতি আর অপশক্তির কাছে আমরা জিম্মি। কিন্তু মানসিকভাবেই অনেকে আছে যারা অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। দীর্ঘ বিচার ব্যবস্থার এই দেশে খুন করলে অনেক সন্ত্রাসীর ফাঁসির আদেশ হয় ঠিকই, কিন্তু সিমির 'আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী' খুনিদের হয় নামমাত্র সাজা। বের হয়ে এসে পরপারে এরা যে সিমির পরিবারের অন্যদেরকেও পাঠাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'- হুমায়ুন আজাদ এক দিন আগেই বলেছিলেন।

'হামারা দিল আপকে পাস হ্যায়'- ঐশ্বরিয়া আর অনিল কাপুর অভিনীত হিন্দি ছবি। ছবিতে ধর্ষিতা হয়ে ঐশ্বরিয়ার নানা সমস্যা দেখে আমার বাসার সবাই দুঃখ করছিল আর অনিল কাপুরের চরিত্রের করছিল প্রশংসা। আমি বলে ফেললাম, ঐশ্বরিয়ার স্থানে একটা মেয়ে আর অনিলের স্থানে আমি হলে তোমরা কী করতে, মেনে নিতে? বলা বাহুল্য, তারা আমার কথার উত্তর দেননি। সত্যিই, 'সবই মধ্যবিত্তের অতি নিশ্চয়তাবোধ থেকে গন্ডি অতিক্রমের ভয়'! পরে ভেবেছি অমন বিপ্লব কী আমার দ্বারা সম্ভব! আজ আমি চাই সম্ভব করতে। আর কিছু না হোক, বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়াতে চাই।

সৈয়দ সারওয়ার রশিদ

ফজলুল হক হল, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনা-৯২০৩

শিশুকন্যাদের সাবধান

অনামিকার চিঠি পড়ে নিরুপায় যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি। আর এ তো সত্যি, আমরা সব মেয়েরাই অবস্থাভেদে একই রকম সমস্যার শিকার। বাড়ির বাইরে পা দেওয়া মাত্রই একজন মেয়েকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে হাজারো সমস্যা। বিয়ে না করে টিকে থাকায় যেমন বিড়ম্বনা, বিয়ে করেও কি তা থেকে রেহাই আছে? এ দেশে শত শত মেয়ে স্বামীর বাড়িতে নির্যাতিত হয়েও নিশ্চুপ থাকে। যারা সাহস করে প্রতিবাদ করে, তাদের হেনস্থাও কম নয়। এমনকি বাবার পরিবারও মেয়ের বিরুদ্ধাচারী হয়। কেননা সমাজ এখনো আমাদেরকে বোঝা মনে করে।

এমন একজনকে জানি তার স্বামী প্রবাসী, শ্বশুরবাড়িতে ঘরকন্না করছে সে। আর প্রায়ই বাড়িতে আগত পুরুষ আত্মীয়দের, নোংরা আচরণ থেকে রক্ষা পেতে লড়াই করছে। অথচ কাউকে বলতে

পারছে না। ভাবুন তো কত অসহায় অবস্থা! আমরা মেয়ে। আমাদের মন ভালো না লাগলে একা একা উদ্দেশ্যহীন যদি রাস্তায় হাঁটতে ইচ্ছা করে, তা পারবো না। বা কোথাও বসে আকাশ দেখতেও নিষেধ আমাদের। নোংরামি থেকে বাঁচতে আমরা নিজেদের ইচ্ছাগুলোকে মেরে ফেলি। তবু কি বাঁচা যায়?

অযথা লজ্জা বা দ্বিধা করে, একটি অপরাধীকে আরো কুকৃতি করবার সুযোগ করে দেওয়া যায় না। ওরা তো চিরকাল আড়ালে থেকেই কদর্য হাসি হাসছে। আসুন না, সবাই মিলে ওদের স্বরূপ উন্মোচন করি।

আমি যখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের এক সম্পর্কের বড় ভাই (মানি না)-এর অশ্লীল ব্যবহার আমাকে বিমূঢ় করেছিল। কাউকে বলতে পারিনি, অথচ সারাক্ষণ আতঙ্ক! ছোটবেলার ঝকঝকে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল এবং সেই থেকেই শুরু হয়েছে নিজেকে রক্ষা করবার গোপন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, আমরা মেয়েরাই কোনো না কোনো সচেতন হতে শিখে নেই। এখন অনেক বড় হয়েছি, কাজিনদের সঙ্গে সহজ আলাপচারিতায় জেনেছি, আমি একা নই; আমার আরো চার-পাঁচটি বোন ছোট্টবেলায় ঐ ভাই নামক ব্যক্তিটির নোংরামিতে আতঙ্কিত সময় কাটিয়েছে। এসব কোনো নতুন ঘটনা নয়, তবু লিখলাম যাতে মায়েরা তাদের শিশুটির প্রতি মনোযোগী এবং সহানুভূতিশীল হন।

আপনার শিশুটিকে যথাসম্ভব নিজের কাছে রাখুন।

একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম, স্বপ্নও ছিল। ভালোবাসার মানুষের জন্য কত কিছুই তো করে মানুষ। আমি তার উপকারার্থে একটি স্বাক্ষর করেছিলাম। তারপর ছেলেটির স্বভাব পরিবর্তন হতে থাকলো। ভালোবাসার ভিত গড়ে শ্রদ্ধাবোধ আর বিশ্বাসে। এই দুটো জিনিস না থাকলে সম্পর্ক শুধু স্বার্থের। অজস্র অশ্লীল কথা (গালি) যে আমাকে শুনিয়েছে, তার সঙ্গে কোনো আপোস নেই। তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে ভালো আছি। আমার সমস্যাটা অনেক জটিল, তবে আমার পরিবার এখন জানে এবং তারা বোঝে আমাকে, এই তো ঢের। স্মৃতির তিক্ততা আমাকে একলা জীবনে টানে। অথচ আমার চাওয়ায় মূল্য নেই। অনামিকা একজন স্বাবলম্বী নারী হয়েও সমস্যায় জর্জরিত। আমি তো সেখানে টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে। ছেলে সন্তানটি যদি লেখাপড়া নাও করে, তবু তাকে চলার জন্য কিছু না কিছু করে দেওয়া হয়। এই নিয়মটা কি মেয়েদের বেলাতেও মা-বাবা চালু করতে পারেন না? সমাজের ভয়? এ ভয় ভাঙতে হবে, সমাজের কোনো দোষ নেই। সময়ের সঙ্গে সমাজকে এগুতে হয় কিন্তু আমরাই দিচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কবে লিখেছেন মেয়েদের দুঃখগাথা-

'... আমার ইচ্ছার নেই জোড়/সাড়া নেই লোভের/ঝাপট লাগে মাথার উপর/ ধুলোয় লুটোই মাথা।'

এখনো তেমনই জীবন মেয়েদের। পরের ইচ্ছায় চলতে চলতে নিজের প্রতিই আস্থাহীন হয়ে পড়ে কেউ কেউ। দুঃখ পাই যখন দেখি প্রগতিশীল পরিবারগুলোতেও যখন 'কনে দেখা' আয়োজনে, মেয়েটির চেয়ে সুন্দর (দৈহিক/বাহ্যিক সৌন্দর্য) ছোট বোনদেরকে আড়ালে থাকতে বলা হয়। একটি মেয়ের হীনম্মন্যতার জন্য এই একটি কারণই কি যথেষ্ট নয়?

একক জীবন বা বহুল জীবন যাই হোক, আমরা তার স্বাভাবিকতা চাই। চাই সুস্থ জীবন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অনামিকা জিততে হবে

লেখাটি পড়ার সময়ই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ ব্যাপারে কিছু লিখব। অথচ প্রায় এক সপ্তাহ পর আজ কলম নিয়ে বসতে পেরেছি। প্রথমেই বলে নিই এ ধরনের লেখা পড়ে মন ভালো থাকে না। মনে রক্তক্ষরণ হয়, সমাজের অথবা পুরুষ জাতটার ওপরই ঘৃণা ধরে যায়। এই তো সেদিন, সম্ভবত এ লেখাটি পড়ার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে আসছি ক্যাম্পাসে। মগবাজার মোড়ে বাসটি জ্যামে পড়ে থেমে আছে- এমন সময় শুনতে পাচ্ছি একটি ছোট মেয়ে খুব সম্ভবত সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, পাশে রিকশা আরোহী তিনটি ছেলেকে বলছে- 'পাগুলো ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবো।' হয়তো বখাটেগুলো রিকশায় উপবিষ্ট তার বড় বোনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেছিল। আমি মেয়েটাকে জোরেসোরে একটা ব্র্যাভো দিলাম। মেয়ে দুটি আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেলো (রিকশা চলছিল, বাসও চলা শুরু করেছিল)। আমার ব্র্যাভো দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটির প্রতিবাদ করার সাহস।

কেন অনামিকাকে বলছি- সাতকাহনে দেখেন, কোলকাতার রাস্তায় যখনই দীপাবলীকে একা হাঁটতে দেখা গেছে, তখনই কিছু পুরুষ নামধারী কুকুর তার পেছনে ঘুর ঘুর করেছে। দীপাবলী কিন্তু পাত্তাও দেয়নি। যদিও এটি উপন্যাসের বর্ণনা, তথাপি আমার মনে হয় সম্ভবত কোলকাতায়ও এমন হয়।

অন্যদিকও আছে। কত মেয়েকে বাসে নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন পর্যন্ত নিজের সিটটি মা, মেয়েকে উৎসর্গ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছি পাক্কা ৩ ঘন্টা। কোনবারই শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদটুকুও পাইনি। নারী-পুরুষের সম্পর্কটা সহজ হতে হবে। এবং অনামিকাদের সাহসী হবার প্রয়োজন। সমাজের অচলায়তন ভাঙার দায়ও তো আপনার মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষিতা মেয়েদের। এর নেতৃত্বও আপনাদের এবং আমাদেরও দিতে হবে। আপনি যে বাসা ভাড়ার কথা বলছেন, সে তো ছেলেদের বেলায়ও ঘটছে। ব্যাচেলর ছেলেরা কি বাড়ি ভাড়া পাচ্ছে? সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে তো প্রভেদ হচ্ছে না। হয়তো একটা প্রভেদ হচ্ছে- সেটা হলো ভ্রূকুটি! আর নাম বদনাম ছেলেরা ঝেড়ে ফেলতে পারে, মেয়েরা পারে না।

তবে এমনও মেয়ে দেখেছি যারা স্বামীদের রুজি করা অথবা কালোবাজারিতে জমানো টাকায় যখন ইস্টার্ন প্লাজায় বিলাসদ্রব্য শপিং করছে, তখন তাকে এতো অহঙ্কারী লাগছে, ভাবটা এমন যে, সেই যেন তা উপার্জন করেছে। মেয়েটি, এই চোর স্বামীর উপার্জন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।

আবার এমনও দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একটি মেয়ে সাধারণ তার চলাফেরা, এমনকি রোজ সে টিউশনিতে যাচ্ছে। হয়তো তার বাবার ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্য। আবার এমনও দেখি যে, তার বাবার টাকা তো খরচ করছেই- অধিকন্তু তার একটি বড়লোক বন্ধু জুটিয়ে তার টাকাও খরচ করছে দেদারছে এবং তা গর্বভরে। এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? দৃষ্টিভঙ্গি? হ্যাঁ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আমাদের পুরুষ, মেয়ে সবার দৃষ্টিভঙ্গির একটা ইতিবাচক পরিবর্তন চাই। চাই না রুমিরা আত্মহত্যা করুক, অনামিকারা পরাজিত হোক। তাদের জিততেই হবে।

এনামুল হক চৌধুরী

৪১৯, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক পরাজিত অনামিকা

আমি কি লিখবো? আমার লেখা, চিন্তা- এসব আমি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছি। 'অনামিকা' যে তার নাম ও পরিচয় দিয়ে লেখা ছাপাতে পারেনি সেই ভীত অথচ আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধাকে বলছি, আপনি অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। যতটা আমাদের দেশের অনেক মেয়েই পারেনি। আমি আপনার লেখা পড়ে গর্ব করে বলতে পারি, হ্যাঁ এমন দু'চারজন নারী আছে যারা খুব সহজে

পাওয়া সুখের জীবন বেছে নেননি। নিজেকে নিজের মতো করে গড়তে চেয়েছেন। আপনি তা পেরেছেন। আর তা পেরেছেন বলেই আজ আত্মবিশ্বাসে আপনি কলম ধরেছেন।

আমি পারিনি। আমিও চেয়েছিলাম নিজের মতো করে বাঁচতে। ভালো ছাত্রীর দলে আমি কখনো থাকিনি। তবুও রেজাল্ট চারটা ভালো ছিল। মনে তাই অনেক আশা ছিল, ভেবেছিলাম একটা চাকরি হলে আমি নিজের মতো করে বাঁচবো। আমি কখনো চিন্তা করিনি একটা ছেলের চোখে আমি কতটা গ্রহণযোগ্য। কেন যেন আমার মাথায় এটা কখনো আসেনি। সমাজে চলতে যাওয়া ছোট ছোট ঘটনা, গায়ে হাত দেয়া, চোখ টিপ দেয়া বা চাপা গলার মন্তব্য আমি গায়ে মাখিনি। আমার মনে হয়েছে আমি যখন ঠিক আছি তখন যার যা ইচ্ছা বলুক। আমি তো পচে যাচ্ছি না। সমস্যা থাকলে তাদের আছে।

যাই হোক, আমি একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে আছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আমি সিলেটে থাকি, সেখানে চাকরির জন্য আবেদন করার মতো তেমন কোনো জায়গা নেই অর্থাৎ কেরিয়ার গড়ার মতো। তাই আমাকে সব সময় ঢাকার কথাই চিন্তা করতে হয়েছে। কারণ ঢাকায় আমার আত্মীয়স্বজন আছে। অন্য কোনো জেলার কথাতো চিন্তাতেই আনতে পারি না। যেকোনো চাকরি বা বৃত্তির চেষ্টায় আমি যখনই ঢাকায় যাই আমি দেখি, আমার আম্মা, বড় বোনরা ও দুলাভাইরা প্রচন্ড টেনশনে থাকেন। আমার মোবাইল নেই, আমার সঙ্গে মোবাইল দেয়া হয়। মিনিটে মিনিটে এক একজন ফোন করে। এক সপ্তাহ ঢাকায় থাকলেই বাসার সবাই টেনশনে আধমরা হয়ে যায়। আমি সহ্য করতে পারিনি। আমার শুধু মনে হয়েছে, আমার জন্য সবার এতো টেনশন। একদিকে চাকরি হচ্ছে না, অন্যদিকে সবাইকে এতো টেনশনে রাখছি। কয়েক মাস আগে বাবার মৃত্যু, বন্ধুর মতো বড় বোন বিদেশে চলে যাওয়া, আমাকে নিয়ে বাসার সবার স্বপ্ন, উৎসাহ দেয়া, টেনশন করা- এসব কিছু আমার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করলো, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমার মনে হলো মাকে টেনশন মুক্ত করা উচিত। আমার নিজেকে স্থির করা প্রয়োজন। কারণ সিলেটে চাকরির জন্য বা বাইরে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে গেলেই কয়েকটি প্রশ্ন আমার সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়। বিয়ে কোথায় হবে? আমি কোথায় থাকবো? তারা কি চাকরির প্রতি উৎসাহিত হবে? আমাকে একা বিদেশে কি পাঠানো উচিত? এতোসব প্রশ্ন আমার ছোট মাথায় আর জায়গা হয়নি। আমি আমার সব স্বপ্ন, সব আত্মবিশ্বাস সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম হ্যাঁ আমি বিয়ে করবো। আমি নিজেকে নিয়ে যখন স্বপ্ন দেখতাম তখন কোনো স্বামী সংসার আমার স্বপ্নে ছিল না। তা ছিল অনেক বড় হওয়া। যেন এমন এক সময় আসে, দেশের মানুষ আমাকে এক নামে চিনবে। এতোটা না হলেও আপনজনরা যেন আমার নামে গর্ববোধ করে বলে, মালিক সাহেবের মেয়ে এমনই হওয়ার কথা। যেহেতু স্বপ্নের কোনো পুরুষ ছিল না, তাই যে কাউকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি ছিল না। আমি বিয়ে করলাম সিদ্ধান্ত নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে। নিজেকে নিজের থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করেই বিয়ে করেছি। কেন? সবাইকে টেনশন মুক্ত করতে। আমি মেনে নিয়েছি যে আমি হেরে গেছি। আপনি যেমন পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিয়ে করেননি, আমি তেমনি পরিবারকে মানসিক মুক্তি দেয়ার জন্য বিয়ে করেছি। আমরা দু'জনেই নিজেকে বলিদান করেছি। আমরা মেয়ে মানুষ বলেই একটা পরিবারকে নিজের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বপ্ন থেকে উপরে রেখেছি। আমার বিয়ের এক মাস হয়েছে। অচেনা, অজনা একজন মানুষ, সে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি লিখছি নিজের মতো করে।

আমি কাকে দোষ দেবো? আমার পরিবারকে? 'না' তারা আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে। আমার সমাজকে? 'না' এ সমাজ বেকারত্বের বোঝা বহন কতে পারছে না। না কাউকেই আমি দোষ দেই না, সবই সময়। এই সময়টা ধীরে ধীরে আসছে। এমন এক সময় ছিল বা আছে যখন পরিবারের ওপর মেয়েদের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু আজ আমরা আমাদের পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করি। সে মতো কাজ করতে পারছি। এ সময় আমাকে এতোটুকু দিয়েছে, আমি দু'হাত পেতে নিয়েছি। আমি হয়তো আপনার থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আছি। এমন এক সময় আসবে যখন আপনি অন্য কারো থেকে পিছিয়ে থাকবেন। সমস্যা থাকবে সেটা যদি একযুগ পরেও হয় তবুও নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। ছোট বড় হিসাব করে নিজেকে ছোট করতে চাই না। আমি আমার মতো, কোনো পুরুষ বা নারীর সঙ্গে তুলনা কেন করবো?

জাকের মালিক

সিলেট

নিয়ম ভাঙতে হবে

অনামিকার লেখাটি পড়ে আমি ব্যথিত হয়েছি, তবে মোটেই অবাক হইনি। কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্রটাই এরকম। নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় অথচ অত্যাবশ্যকীয় বাস্তবতা নারী-পুরুষ দু'পক্ষই মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় কিছু মানুষের জন্য। যদিও তারা আমাদের মতো মানুষ কিন্তু চরিত্র এবং মানসিক দিক থেকে নীচু শ্রেণীর জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। চারটি জীবনে হাসি ফোটাতে অনামিকা এখনো পর্যন্ত একাকিত্বকে বরণ করে রেখেছে। আবার চলার সাথী হিসেবে কাউকে বিশ্বাস করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সে বিশ্বাসও ধরে রাখতে পারেনি। প্রচলিত তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের মতো মানুষদের প্রতিনিয়ত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

যৌতুক যেমন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার জন্য অভিশাপ, যৌতুক ছাড়া বিয়ে করা তরুণের জন্যও তেমন অভিশাপ। সুদূর ঝালকাঠির এক অজপাড়াগাঁয়ের এক মেয়েকে বিয়ে করি পারিবারিকভাবে সকল প্রকার সামাজিকতা বজায় রেখে। চট্টগ্রামের বিয়ের ঐতিহ্য অনুসারে হাজার লোকের ভোজনপর্ব থেকে শুরু করে সব সামাজিকতা আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করা হয়। শুধু ব্যতিক্রম ছিল যৌতুক। ওটা আমি গ্রহণ করিনি। এটাই তখন আমাদের সমাজে 'টক অব দ্য সোসাইটি' হয়ে যায়। অথচ বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সূত্রে আমি তাকে একবার মাত্র দেখেছি।

দীর্ঘ ৩ বছর পরও মাঝেমধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা নিয়েছি কিনা। বিশেষ করে মহিলা আত্মীয়স্বজনদের মুখে কথাটা ঘুরে-ফিরে আসে। আসলে আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার একটু এদিক-ওদিক হলেই রব ওঠে। চরিত্র অনুযায়ী আলোচনার পাখা গজায়। বিষয়টি আমার নিজ ইচ্ছের স্বাধীনতা এবং আমাদের পারিবারিক। কিন্তু মানুষ অকারণে এটা একটি সামাজিক সঙ্কট হিসেবে গসিপে আনতে চায়। একজন নিয়ম ভাঙা মানুষ পেছনে টেনে ধরা। যাকে আপনারা বলেছেন অচলায়তন। হ্যাঁ অনামিকাদের এটা ভাঙতে হবে। এর এক একটি ইটে ব্যক্তি আঘাতের মাধ্যমে।

মোঃ ছালে জংগী

হালিশহর, মুনির নগর, মুন্সীপাড়া
বন্দর, চট্টগ্রাম

নিজেই লড়তে হবে

অনামিকার চিঠি পড়ে আমি বিস্মিত না হলেও থমকে গেছি। বিস্মিত এ জন্যই হইনি পুরুষশাসিত সমাজে এটা নতুন কিছু নয়। থমকে গেছি কারণ এর প্রতিকার কি তা ভেবে। এ সমস্যা

অনামিকার একার নয়, সাময়িকও নয়। এর ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। কমবে বলেও মনে হয় না।

এবার আমি অনামিকার কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে লিখে এ লেখা শেষ করব।

সমাজের একজন হয়ে স্বাধীন সত্তা নিয়ে নারীর বাঁচার অধিকার পুরুষ ছিনিয়ে নেয়নি। বরং ঐসব কিছু নারী নিজেই হারিয়েছে। নারী দিতে চায় পেতে চায় না এই ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

রেস্তোরাঁয় একলা নারীর খাওয়া কেউ ঘুরে ঘুরে দেখলে তাতে কি আসে যায়? আমার মনে হয় আমাদের দেশে মেয়েরা নিজেকে আগে ভাবে নারী, পরে মানুষ। রেস্তোরাঁর ব্যাপারটা নারীর স্বাধীন সত্তার জন্য কোনো অন্তরায় বলে মনে হয় না। মানুষ প্রথম প্রথম দেখবে, তারপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি একা রেস্তোরাঁয় ছেলেরাও সংকোচ বোধ করে।

বাস কন্ডাক্টরের ব্যাপারটা আপনার লেখা পড়ে আমি বিষয়টা খেয়াল করেছি। ঘটনা প্রায়ই ক্ষেত্রে সত্য হলেও কোনো মহিলাকে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। আপনার নিজের কথাই ভাবুন- নির্জন গৃহে একা পুরুষের বিরুদ্ধে আপনি বঁটি ধরতে পারলেও বহুলোকের মাঝে বাসের হেলপার বা কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেননি। ওরা পুরুষ তাই প্রতিবাদ করলে অন্য পুরুষেরাও ওদের সমর্থন করবে যদি তাই ভেবে থাকেন তবে তা হবে ভুল। আপনি একদিন প্রতিবাদ করে দেখুন পুরুষরাই আপনাকে সমর্থন করবে।

এককভাবে থাকার অধিকারের ব্যাপারটা জটিলই বটে। এবং এ সমস্যা নারীর একার নয় পুরুষেরও। অনেক ব্যাচেলর পুরুষকে মেসের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পারা সত্ত্বেও তা মেনে নিতে হচ্ছে। আপনাদেরও মেনে নিতে হবে।

অনামিকার প্রশ্ন একক নারী বলেই তার চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব সমাজের ওপর ন্যস্ত হবে কেন? আমার প্রশ্ন, একক নারী কি সমাজের কেউ নন? মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে মানুষ বাধ্য। একক নারী বলে নয় প্রতিটি মানুষেরই সমাজের কাছে কিছু না কিছু দায়বদ্ধতা থাকেই। এখানে অনামিকা চরিত্র রক্ষার ব্যাপারে যা বলেছেন তার অর্থ ব্যাপক হলেও আমি মনে করি একক নারীর ক্ষেত্রেই শুধু নয়, পুরুষের তথা প্রতিটি মানুষেরই চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব সর্বপ্রথম তার নিজের ওপরই বর্তাবে। কেননা চারিত্রিক ব্যাপারে যে কোনো কালিমা আগে আসে ব্যক্তির পরে সমাজের ওপর। নারীর সর্বনাশের ব্যাপারে তার রূপের চেয়ে প্রাধান্য পায় সে নারী এবং তার দেহের যৌবন। নারীজাতির চরম সর্বনাশের জন্য এই দুটো ফ্যাক্টরই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সমাজ যে নীতি গ্রহণ করে তা লজ্জাকর। ঐ লজ্জাকর নীতিটা হলো আমাদের সমাজে শুধু নারীর চরিত্রই নষ্ট হয়, পুরুষের নয়।

অনামিকা, আজ আমাদের সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় যেভাবে দ্রুত অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে ভালো কিছু আশা করার মতো মনের জোর আর নেই। তারপরেও কিছু কিছু ব্যাপার আশা জাগায়। যেমন অমিতের অসুস্থতা এবং তার প্রতি মানুষের সহমর্মিতা।

অনামিকা, আমার লেখা পড়তে যতটুকু সময় লাগবে জীবন তার চেয়েও ছোট। জীবন ছোট কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আর ঐ আকাঙ্ক্ষা জাগে ভালোবাসা থেকে। আট-দশ বছর আগে বৃদ্ধ বাবা, ক্লান্ত মা, প্রতিবন্ধী ভাইয়ের ভালোবাসা আপনাকে এতোটা পথ নিয়ে এসেছে। তাদের ভালোবাসা আপনার আগামী দিনের চলার পথে সাহস জোগাবে। ভেঙে পড়বেন না। আপনার মতো মেয়েরা যদি হেরে যান তবে অন্যেরা কি করবে? ছোট্ট এ জীবনে শত প্রতিকূল অবস্থায় থেকে সবকিছু সামলে চলার নামই তো জীবন।

অন্যের প্রতি সামান্য সহানুভূতির দৃষ্টি দেয়ার সময়ও যেন কারো নেই। এখানে কেউ হারবে কেউ জিতবে। অন্যকে কেউ জিতিয়ে দেবে না, নিজেকে জিততে হবে। আপনার চিঠি আর কিছু না করতে পারলেও শত শত বিবেককে নাড়া দিতে পেরেছে এটাই বা কম কিসের?

আদিব মাহমুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা

নারীর অক্ষমতা পুরুষের অক্ষমতা

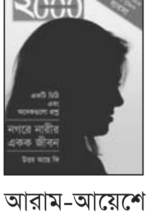

অনামিকা সত্যি কথাই লিখেছেন। তবে উপসংহারে যেতে পারেননি। যেহেতু যাওয়া সম্ভবও নয়। মেয়েদের সামনে দুটো অপশন আছে। স্বাধীনতা অথবা আরাম-আয়েশে অন্যের ঘাড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তিসহ নানাবিধ আমোদ এবং দুঃখ বা দুঃখ বিলাস।

স্বাধীনতা আবার দু'প্রকার, বল্গাহীন স্বাধীনতা আর দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা দায়িত্ব পালন করে করে অর্জন করতে হয়। মেয়েরা মুখে যাই বলুক বেশির ভাগই প্রথমত স্বাধীনতার পক্ষে। আরাম-আয়েশ ঠিক রেখে বা ঠিক রাখার যোগানের উৎস ঠিক রেখে স্বাধীনতার কথা বলে উঁচু গলায়। সমস্যাটা মূলত এ জায়গায়। বিশেষ করে যারা শিক্ষিত এবং সচ্ছল শ্রেণী থেকে আগত। খুবই বিরল ক্ষেত্র ছাড়া কোনো সাধারণ চাকুরেকে বিয়ে করেছে উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চপদে আসীন কোনো মেয়ে। একবার ভালো বেতনওয়ালা মেয়েদের পাত্রদের চাহিদা নমুনা যাচাই করুন। যদি তাই হয় তবে পোষ্যকে তো চলার গন্ডি নির্দিষ্ট করে দেবেই সুপিরিয়ররা। যা পুরুষরা করে থাকে। আমরা আসলে যে সামাজিক ব্যবস্থার সময়কাল কাটাচ্ছি তা হলো, একশ' বছর আগেকার মাইগ্রেটেড ইটালীয়-আমেরিকানদের সামাজিক ব্যবস্থার মতো। সেই সময় ইটালীয়দের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। কনে দেখে ছেলেরা বিয়ে করতো। বুড়ো মা-বাবাদের ছেলেরা দেখতো- এরকম আরকি। এখন সেসব ধুয়ে মুছে গেছে। আঠারো হলেই ঝেঁটিয়ে বিদায়। বর পছন্দ না হলে দু' দিনেই ডিভোর্স। ছেলেরাও তাই। বাবা-মা সে বহুত দূর। ওল্ড হোম বাঁধাই আছে কপালে। সবই চলে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার। একটা অর্জনে আরেকটা তো বিসর্জন দিতেই হয়।

নন পারমিসিভ সোসাইটিতে থেকে আধা পারমিসিভ সামাজিক অবস্থান চাইবেন সেটা হয় না। কেউ কোনো সমাজবিদ, রাষ্ট্রবিদ আপনাকে এ গ্যারান্টি দেবে না অনামিকা। খুব বেশি চাইলে আইনের একটি শক্ত প্রায়োগিক অবস্থান চাইতে পারেন। আধা পারমিসিভ বলছি এ কারণে, আপনি মুগুর ছাড়া ঘুরবেন ফিরবেন আর কুকুররা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে না এ আশাটা বড় বেশি। সমস্যাটা যদিও কম তবে পুরুষেরও আছে। ভালো চাকরি করে অথচ বিয়ে করছে না তার ঝামেলাটাও দেখুন কম নয়। তবে সে সেটা মোকাবেলা করছে অথবা সুযোগ নিচ্ছে।

রাস্তায় মেয়েদের টিজিং করা মহাঅপরাধ। তবে আমাদের আশপাশের দেশগুলোতে এর বিস্তার আছে। এর প্রতিকার আছে তবে হবে না। কারণ আমাদের রাজনীতিতে কোনো খারাপ জিনিসটা নেই যা লালন করা হয় না।

সমস্যার আরো দিক আছে। সেটা জৈবিক। অবদমন বা সংযত দুটো কার্যকারণ আধুনিক মানুষদের একটি উপাদান। তবে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারটা হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষদের অদম্য আকর্ষণ। কেউ যদি বলে এটা সভ্যতার ভুলভাবে বেড়ে ওঠার জন্য হয়েছে তা হলে সেটা আরেক বিভ্রান্তি। এটা প্রাকৃতিক।

অনামিকা আপনি আপনার পরিবারের জন্য অনেক করেছেন। লিখেছেন। আপনি কি জানেন পুরুষদের অক্ষমতা নারীর কাছে কতটুকু ঘৃণিত? সেইসব পুরুষরা কি করে একটু খোঁজ-খবর নিন। পরিবারের জন্য

সবাই করতে চায়। আপনি নারী বলে বিশেষ বিবেচনা চাইছেন লিখে। কিন্তু না লেখার দলেও অনেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আছেন। পত্রিকায়ই বেরিয়েছিল, ভাতের অভাবে মা শুধু পানি খেয়ে রোজা রেখেছেন জেনে দিনমজুর ছেলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কয়েক বছর আগে ভোলায় (পত্রিকান্তরে প্রকাশ) ছোট-ভাইবোনদের কাছে মাপ চেয়ে রাতে বড় ভাই অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। তাদের দুঃখটা কি এক সাগর পরিমাণ ছিল না?

আমি নিজে একটা ছোট চাকরি করতাম। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অনেক ধারদেনা করে ছোট বোনকে বিয়ে দিলাম। এক দিন পারিবারিক কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাবা বললেন, 'জানি তো তুইতো সাত জায়গা থেকে ভিক্ষা করে বোন বিয়ে দিছস, জানি না?' বুঝলেন তো, অনেক অন্যায় করে ফেলেছি এখন একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছি, বউ প্রতিদিন বলে, বুড়ো। সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলবেন তো, রবীন্দ্রনাথও তার বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়েতে যৌতুক দিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। তিনি তো রবীন্দ্রনাথ। আর আমরা নির্বিশেষে চুনোপুঁটি। তবে সান্ত্বনার বিষয় সেই কাল থেকে এই কাল অব্দি সামাজিক নিগড় ভাঙার চেষ্টা করছি, অন্তত বলছি।

* পারবেন একাকী জীবন যাপন করতে, আর কটা দিন যাক। কেউ আর তাকাবে না। যেমন আইবুড়োদের দিকে তাকায় না কোনো তরুণী।

* একলা বসে খাবার সম্ভাবনা এই দেশে আছে। তবে তথাকথিত উন্নত বিশ্বে একলা টেবিলে একজন মেয়ে দেখলেই অন্য একজন 'এক্সকিউজ মি' বলে বসে পড়ে। সেখানে সহ্য হলেও এখানে আপনি সহ্য করবেন না। সহ্য করুন, খারাপ লাগবে না।

* বাসের নতুন যুগ শুরু হয়েছে। টিকেট কেটে লাইন ধরে ওঠা। কোনো কনডাক্টর নেই। যদি অশ্লীলভাবে ওঠায় পুলিশে অভিযোগ না করতে চান তো নিজেই সপাটে চড় মারুন।

* বস্তিতে হায়েনারা হানা দেবে না এমন দিন আসার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে ক্ষীণ। হায়েনাদের কে পালে? হায়েনাদের কাছ থেকে বখরা খায় কারা? এরপর অন্তত ভোটটা দেয়ার সময় মার্কা আর দল চিন্তা না করে ভালো মানুষকে দিন। যারা দেশ চালাতে অক্ষম তারা সমাজ বদলাবে কি!

তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই বিষয়গুলো একটা প্রাচীনতম সমস্যার বিষয়। তবে আলো আর বাতাস আসতে শুরু করেছে। আমরা তো আর বল্লালী কুলীন যুগে পড়ে নাই। সতীদাহও লুপ্ত হয়েছে অনেক দিন হলো। অপরাধীর শাস্তি চাইতে পারি। ভিন্ন পথে চলতে চাইলে এই সংগ্রামটুকু শিকার করতেই হবে। যে ছেলেটা পড়াশোনা ছেড়ে গান নিয়ে থাকে, ছবি আঁকতে চায় তাকেও পদে পদে পারিবারিক, সামাজিক ঝামেলা পোহাতে হয়। আসলে কেউ আমরা আমাদের মতো করে সব পাই না।

সাইদ মির্জা

১৪, আমবাগান, রাঙ্গামাটি, সাভার, ঢাকা

এতটুকু আশা বিশুদ্ধ সাম্যতা

পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পুরুষের সুবিধাজনক অবস্থানের ওপর। পৃথিবীর সব কর্মকান্ডের পরিচালক পুরুষ নিজে। কিন্তু যখন দরকার জৈবিক চাহিদার, তখন দরকার নারী- এ হলো পুরুষের নারী দৃষ্টিভঙ্গির মূলমন্ত্র। অর্থাৎ, মানুষ হিসেবে নারীর মূল্য নয়, মূল্য তার নারীত্বে, যে নারীত্বের কারণে নারী আজ রমণী, যৌনাবেদনময়ী। সহস্র বছরের বিধি-নিয়মের কারণে পুরুষ আজ গৌরবান্বিত, কারণ সে প্রভু। সে প্রভু পৃথিবীর, সে প্রভু তার নিজের এবং অন্যে নারীর নারীত্বের কারণ পুরুষ একাধিক নারীভোগের স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে সর্বদাই। যখন নারী তার মাথা উঁচু করেতে চেয়েছে তখনই পুরুষ সে প্রভুত্বের আড়ালে নারীর উন্নত মাথা ভস্মীভূত করতে চেয়েছে। মতিচুর প্রথম খন্ড দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি' তে বেগম রোকেয়া সে রকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন- 'শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্তত দেখে তখনই মাতা বলেন, ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু! ঘুম না পাইলেও শিশু অন্তত চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেইরূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে, ঘুমাও, ঘুমাও ঐ দেখ নরক। মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।'

নারীকে তার অবমুক্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপে উঠতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সিঁড়িতে। কারণ এ কথা সকলেই জানেন, পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি হলো সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা। যার পায়ের নিচে চাপা পড়ে আছে নারীর স্বাধীনতা। আমি বলছি না নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেই তার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু একথা সত্যি যে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া মানেই মুখ ফুটে কথা বলবার জন্য অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া। পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার গদি হারানোর উপক্রম হয়েছে। তাই ধোঁয়া তোলা হচ্ছে, 'নারী এ কাজের উপযুক্ত নয়, ও কাজের উপযুক্ত নয়'। হুমায়ুন আজাদের মতো আমিও বলতে চাই, 'নারীকে শিক্ষার থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায় না, নারী অশিক্ষিত, তাকে বিজ্ঞান থেকে বহিষ্কার করে বলা যায় না নারী বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত। তাকে শাসনকার্য থেকে নির্বাসিত করে বলা যায় না নারী শাসনের যোগ্যতাহীন। নারীর কোনো সহজাত অযোগ্যতা নেই। তার সমস্ত অযোগ্যতাই পরিস্থিতিগত, যা পুরুষের সৃষ্টি বা সুপরিকল্পিত এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'। কাজ করার অভিজ্ঞতা নারীকে দেবে পেশা। আর পেশা প্রতিষ্ঠা করবে প্রভুত্ব। নারী আজও নির্যাতিত। এ নির্যাতিত নারীর ভালোমন্দ বিবেচনার সুযোগ আজও পুরুষের হাতে। এ নির্যাতন থেকে মুক্ত হবার স্বপ্ন, নারী দেখছে দুশো বছর ধরে। এ মুক্তির পথ সুগম হতে পারে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি'-তে রোকেয়া সে অভিমতই ব্যক্ত করেছেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সে পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?'

নারীর সৃজনশীলতা বিকাশের আরেকটি প্রধান অন্তরায়ের নাম 'তথাকথিত শিক্ষিত নারী'। হ্যাঁ, ঐসব শিক্ষিত নারীরা যে শিক্ষাটুকু শিখেছে তা 'স্বামীগৃহে দাসত্বের বিনিময়ে সুখ' পাবার আশাতেই শিখেছে। তারা শিক্ষিত গৃহিণী, অনেকটা শিক্ষিত গৃহপরিচারিকার (?) মতোই। তারা সামান্য সুবিধা, সামান্য বিত্তের বিনিময়ে হয়ে যায় স্বামীর 'প্রমোদবস্তু' কিংবা 'প্রমোদসঙ্গিনীতে। তারা ধরেই নেয় যে, কর্মজীবী নারীরা ততোটা সচ্ছলতায় থাকে না, যেভাবে তারা স্বামীর অধীনে বিত্তবৈভবে, স্বর্ণের মোড়কে থাকতে পারছে। তারা বুঝতেই পারে না যে, তাদের স্বামীর গয়না আর প্রসাধনী দিয়ে তাদের মুড়িয়ে রাখে আরো বেশি রমণীয়, ভোগ্য, যৌনাবেদনময়ী করে তোলার জন্য। এই নিশ্চয়তা একটি মেয়ের পিতা-মাতার স্বপ্ন, যে স্বপ্নের বুনন মেয়েটির মধ্যেও ছোটবেলা থেকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

আমার এ উচ্চারণের উদ্দেশ্য কোনো পুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়। কিংবা ছোট করা নয় আত্মপ্রসাদমুগ্ধ কোনো গৃহিণীকে।

মানুষ হিসেবে আমি চাই সমাজ মানবিকতার বিকাশ। আর এই মানবতার ধারক নারী-পুরুষ উভয়ই। নারী এগিয়ে আসবে তার অবস্থান প্রয়োজনানুপাতিক দৃঢ় করতে, যা মানবতার জন্য অপরিহার্য।

আজ 'অনামিকা' নিতান্তই পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকায় এসেছে তার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়তে। এটা যতখানি তার আত্মপ্রসাদ, তার চেয়ে বেশি জীবনের জন্য অপরিহার্য। সমাজের পুরুষদের বুঝতে হবে বাংলাদেশে এরকম অনেকগুলো 'অনামিকা' আছে যাদের কিছুই করার থাকে না বাইরে যাওয়া ছাড়া, তার বিপদগ্রস্ত পরিবারের জন্য।

এঙ্গেলস্ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক শোষণহীন সমাজের, ঐ সমাজে সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে আবার ফিরে আসবে নারী। উৎপাদনের উপায়গুলো হবে সমাজের সম্পত্তি, সেখানে কেউ সুবিধাভোগী কিংবা কেউ সর্বহারা হবে না। এ প্রথা সত্যি হয়ে উঠবে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য। পরিবারের রূপ থাকবে না এখনকার মতো। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে, শিশুপালন ও শিক্ষা হবে সামাজিক ব্যাপার। মানুষ হবে সমাজের সন্তান। এরকম একটি সমাজের জন্য আমরা নারী-পুরুষ উভয়ই কি একসঙ্গে কাজ করতে পারি না? যেখানে তৈরি হবে নারী-পুরুষের বিশুদ্ধ ও সত্যিকারের সাম্যতা...

আমরা পারব। অন্তত আমি আশা করতে পারি। আশা করতে ভালোবাসি।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
বি.কম (সম্মান)
habib_bangladesh@yahoo.com
habib_bangladesh@hotmail.com

ভরা কাটালের জোয়ার

অনামিকা, প্রথমেই বলতে হয় আপনি সৌভাগ্যবতী। সেসব সৌভাগ্যবতীদের একজন যিনি অন্তত বর্ণমালার চিত্রায়ণে চেপে রাখা ক্ষোভ, দুঃখ, রাগকে ৫৬ হাজার বর্গমাইলে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, দগ্ধতার রেশটুকুর ভাগ অন্যদের দিয়ে হালকা হতে পারলেন। কিন্তু, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনামিকার কপালে তাও জোটে না। কারণ তারা বর্ণমালা চিনে না। যৎসামান্য চিনলেও পত্রিকা পড়ার ভাগ্য হয় না। সমতল বাংলার নিঝুম গাঁগুলোতে একই সাদামাটা রুটিনে তাদের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য সবই কেটে যায়। যন্ত্রণায় আগ্নেয়গিরির লাভা ছড়ানোর তাদের উপায় একটাই, অশ্রু। শাড়ির আঁচলই তাদের প্রবোধ। ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদবে সে সুযোগ তাদের কাছে বড্ড কমই। তাই ভাবুন, কতটা পরিপূর্ণ আপনার প্রাপ্তির ভান্ডার। এটুকুই তো ঈর্ষণীয় হতে পারে? নয় কি?

এমন অনামিকাকে কি আপনি চিনেন, যে ভালোবাসার টানে মা-বাবা, পেছনের সব বন্ধন তুচ্ছ করে একজন 'প্রিয়তমে'র হাত ধরে নতুন এক বাড়িতে উঠেছিলো। অথচ মেহেদির রঙ থাকতেই যার দেহ রঞ্জিত হয়েছে 'প্রেমিকে'র পরিবর্তিত নখের। 'যা! তোর বাপ থেকে টাকা নিয়ে আয়'। কোথায় যাবে সে অনামিকা?

আচ্ছা এখন এক বৃদ্ধা অনামিকার গল্পই বলি, নিরুদ্দেশ হয়ে যায় স্বামী। সামনে, হাতে, কোলে, বুকে মিলে চার সন্তান। চারটিই ছেলে। সাড়ে ছয় গন্ডা ভিটে, ব্যাঙাচি ভরা পুকুর, অনুর্বর আধা বিঘে এক ফসলি জমি। ঘোর অমাবস্যার বুক চিরে কোমরে শাড়ি প্যাঁচান দুই ক্লাস পড়ুয়া ত্রিশোর্ধ্ব অনামিকা। কুমড়া-শসা-লাউয়ের মাচা, নাইলোটিকা মাছ, দুটি দুধেল গাই, এক দঙ্গল হাঁস-মুরগি, প্রতিবেশীর ফুটফরমাস খাটা, বাঁশ বেতের কারুশিল্প, পাড়ার বউঝিদের ব্লাউজ, পেটিকোট সেলাইয়ের ওপর নাও চালিয়ে অনেক সাগর পাড়ি দিয়েছেন। চার সন্তানই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বুড়ি অনামিকার জন্য একটি থাকার ঘরের যে বড়ই অভাব। কোথায় যাবে চলৎশক্তিহীন এ বৃদ্ধা মা অনামিকা?

টানা ১২ ঘন্টা সেলাই মেশিনে সমস্ত কর্মশক্তি নিঃশেষ হওয়ার পর শরীরটা যখন আর চলতে চায় না তখন যে জিএম সাহেবের রুমে ডাক পড়ে। নিশ্চল মূর্তির মতো ফ্যাল ফ্যাল চোখে যে বহু অনামিকাকে লোলুপ, নরপিশাচ চাকরিদাতার নির্মম পেষণ দাঁত মুখ চোপে সহ্য করতে হয়। পিছুটান তো ঐ একটাই অচল বাবা, অশ্রুসজল মা, অপরিণত অনুজ। ভাবতে পারেন, আপনার কর্মস্থল? আপনি কতটা সৌভাগ্যবান?

উপমাগুলো দেয়া হলো আপনার অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য। আমি পুরুষ। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ। অধিকতর স্বচ্ছতা দিতে পারেন প্রবীণরা। যেখানে আবেগের চেয়ে অভিজ্ঞতাই বেশি।

ঢাকা শহরে একা বাসা ভাড়া করার বিড়ম্বনা আপনার চেয়ে ছেলেদের কোনো অংশই কম নয়। ব্যাচেলর বলে মুখের ওপর গেটলক্। এটাকে মজ্জাগত সামাজিক কুসংস্কারের অংশই বলা চলে। যেমন রয়েছে 'খালি কলসি দেখলে দিন খারাপ যাবে'।

সমাজ এমন কোনো বস্তু নয় যা আসমান থেকে আসে, আর আমরা হুড়মুড় করে এতে ঢুকে পড়ি। দিন-মাস-বছর-যুগের পলল জমতে জমতে, প্রত্যেকটি মানুষের বিশ্বাস-আচরণ-অভিব্যক্তি এবং কর্মকান্ডের সংঘর্ষ ও সম্মিলনের 'সমাজ' নামক অস্পৃশ্য' ভাবনাটির উৎপত্তি। ভাবুন তো, আজ থেকে ৫০ বছর (মহাকালের তুলনায় যা ক্ষিয়ৎক্ষণ মাত্র) পূর্বে বাসে ওঠার সময় মহিলাদের গায়ে কেউ হাত দিতো কি না? উত্তর- না। তাহলে মহামূল্যবান এ 'বোধ'গুলো কিভাবে হারিয়ে গেল? কোনো সমাজ বোধ হয় কোথাও গাড়ির পেছনে এমনভাবে ঘোড়া বাঁধেনি!

ঔচিত্যবোধ দিয়ে ভালোবাসা হয় না। তবুও বলছি, 'নিজেকেই সর্বাধিক ভালোবাসা উচিত'- এ শাশ্বত বিধিকে লঙ্ঘন করে মা-বাবা-ভাইয়ের পিছুটানকেই ভালোবেসেছেন। সেবিকা জীবন বেছে নিয়েছেন কিন্তু 'ঘরের' লালসাও পোষণ করেছেন। দ্বৈততার মল্লযুদ্ধে বার বার হোঁচট খেয়েছে আপনার মধ্যযৌবনের প্রাকৃতিক স্রোতস্বিনী। ঠিক এখানেই বাকি সবার প্রতি অভিমান ফুঁসে উঠেছে। দুঃখ পাবেন না। অচেনা আপনাকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। যন্ত্রণার পিছুটান, দায়িত্বের বোঝা সময় সময় ভিন্নধাঁচের অহমিকার জন্ম দেয়। যার ফলাফল অনিবার্য একাকীত্ব।

ভরা কাটালের জোয়ার ঠেকায় কার সাধ্যি? আগ্নেয়গিরির মুখ চেপে ধরে লাভা উদ্গীরণ বোধ করার কোন্ প্রযুক্তি মানুষের আছে? পাহাড়, জঙ্গল, চড়াই-উৎরাই পেরুনো স্রোতস্বিনীর বুকে পাথর চাপা দিলেই কি সে রুদ্ধ হবে?

পিছুটানের নোঙরটি একটু হালকা করুন। এমন অনেক হালকা গৃহস্থালীর কাজ আছে যা বৃদ্ধরা করে সংসারে স্থবিরতা দূর করতে পারে। কেমন প্রতিবন্ধী তা লিখেননি। তবে তরুণ ভাইটা কিছু তো নিশ্চয়ই করতে পারে, যেমন বহু প্রতিবন্ধী পারে। এভাবেই দায়িত্বের বোঝা হালকা করুন। ভালোবাসতে শুরু করুন নিজেকে। স্বপ্ন দেখুন। উদার, বিশ্বস্ত, সহানুভূতিশীল, প্রেমিক পুরুষের সংখ্যাই সমাজে বেশি। বেছে নিন তাদের একজনকে। একঘেঁয়েমি, ক্লান্তিকর, বন্ধুহীন নয় কর্মচঞ্চল, ব্যস্ত, স্বপ্নিল একটি সংসারই আপনার হবে।

আর জোড়াতালির কথা বলছেন। বিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুয়া খেলা, সবচেয়ে বড়। সে জুয়ায় আপনিও মেতে উঠুন। দেখা যাক কি হয়?

আবুল কালাম আজাদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
azad2azad@yahoo.com

মানুষের স্বাধীনতা

আপনার পত্রিকার ২৫শে এপ্রিল ০৩ইং সালের প্রচ্ছদ কাহিনী 'নগরে নারীর একক জীবন' সম্পর্কে আমার মতামত এবং অনামিকার প্রশ্নের

উত্তর জানালাম।

১ : কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মানুষ হিসেবে মানুষের স্বাধীনতা নেই। এই জন্য সবাইকে সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, তখনই ছেলে-মেয়ে সবার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

২ : যেদিন যে যার চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে এবং নারী বা মেয়ে মানুষ দুর্লভ মনে হবে না, সেই দিনই কোনো রেস্তোরাঁয় বসে একলা খাওয়া সম্ভব।

৩ : যদি না মহিলাদের জন্য আলাদা বাস বা পরিবহন না হয় এটা চলবেই। তবে মহিলাদের এ ব্যাপারে একটু সহনশীল হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন, আমি ইউরোপের ঘনবসতি শহর রোম, প্যারিস, লন্ডনে যখন মেট্রোতে চলাফেরা করি তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা নারী/পুরুষ গাদাগাদি করে সবাই কাজে ছুটি বা সবাই ছোটে। অনেক সময়ই দেখেছি মেয়েরা পুরুষের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে যার মতো চলে যাচ্ছে। এখানে এতে কারো কোনো আলাদা অনুভূতি নেই বা হয় না। বাংলাদেশের নারীরাও যদি এমন সহনশীল হয় তবে আর সমস্যা থাকে না। মানে মেলায় গেলে ঠেলা সামলাতে হবেই। পুকুরে নেমে যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না এতো চলবে না!

৪/৫ : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে, স্কুল/কলেজে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেদের যে আলাদা আকর্ষণ থাকে মেয়েদের তা তাহলে কমবে এবং এতেই মেয়েদের স্বাভাবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। যেমন বাংলাদেশে অবাধ মেলামেলার সুযোগ পেতাম না বলে মেয়েদের অন্তর্বাস দেখলেও কামনা জাগতো, মেয়ে দেখা তো দূরের কথা। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপে খোলামেলা মিশি বলে একমাত্র আমার বান্ধবী ছাড়া অন্য নারীকে নগ্ন দেখলেও আলাদা অনুভূতি জাগে না।

৬ এবং সর্বশেষ : কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নর/নারীরই আলাদা থাকা উচিত নয়। একা থাকলে সমস্যার সৃষ্টি হবেই। শারীরিক/মানসিক সব দিক দিয়েই ক্ষতি। একা একান্ত থাকতে চাইলে পরিস্থিতি অনুযায়ী চলা উচিত তাহলেই সমস্যা এড়ানো যাবে। রাশিয়ায় বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা না ধরে যখন যেখানে যেমন তেমন চলা উচিত। সর্বশেষ কথা, ছেলে-মেয়ের ভেদাভেদ সামাজিকভাবে কমিয়ে আনতে হবে এবং অবাধ মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আখতারুজ্জামান খান লিটন

রোডে বার্গবেগ্-১২১/১২৩

ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মানি

ফোন/ফ্যাক্স : ০০৪৯-১৭৪-৮৫৭৪৬১১

তালি না দিয়ে বদলে ফেলুন ...

আপনার প্রশ্নগুলোর আলাদা আলাদা জবাব দেয়ার চেষ্টা করা মানে ছেঁড়া পোশাক না পাল্টে তাতে দামি কাপড়ের তালি মেরে চালিয়ে দেয়ার মতো হবে।

প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হলো সুশাসন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এ জন্য সমাজটাকেই পাল্টে দিতে হবে। পাল্টানোর প্রসঙ্গ এলেই প্রশ্ন আসবে কিভাবে, কত সময়ে, কাদের দ্বারা হবে এ কাজ। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনোকিছুর বদল হবে না। কোন ধরনের শাসন চাই সেটা ভিন্ন থিসিস। আমি সরাসরি দ্বিতীয় পর্বে যাই।

সমস্যাগুলোর প্রকৃতিকে ব্যষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে Individual Personality-র ওপর জোর দিয়ে বলতে চাই, নারী-পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভিন্ন। এ ভিন্নতার জন্যই তারা একে অপরকে আকর্ষণ করে ও মিলতে চায়। এ আকর্ষণ ও মিলতে চাওয়ার ক্ষেত্রে দুটো উপাদান কাজ করে। প্রথমত যৌনতা, দ্বিতীয়ত, তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির নৈকট্য অর্থাৎ রুচি পছন্দ চিন্তা চেতনার ঐক্য। এ আকর্ষণ করতে গিয়ে মিলতে চাইতে গিয়ে Approachটা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়ে যায়- তার শিক্ষা, মনোভাব, বিচার বিশ্লেষণ, ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধের পার্থক্যের কারণে। আবার নারী-পুরুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির নৈকট্য তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। এখানে সহমর্মিতা থাকে এবং প্রাথমিকভাবে যৌনতা থাকে না। কিন্তু বন্ধুত্ব হবার পর স্বাভাবিক গতিতেই যৌনতা চলে আসে বা আসতে পারে। এখানে যৌনতা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তাও ব্যক্তির Approach-এর ওপর নির্ভর করে। নারীর Approach-পুরুষের কাছে অশ্লীল মনে হলে বন্ধুত্ব থাকে না তেমনি পুরুষের Approach-নারীর কাছে অশ্লীল মনে হলে, গ্রহণযোগ্য না হলে বন্ধুত্ব থাকে না। এটা দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার। যার যার রুচির ব্যাপার।

অনেক সময় কপট ব্যক্তি খুব সুন্দর Approach করে বন্ধু হয়ে বস্তুগত স্বার্থ কিংবা যৌনতা প্রাপ্তির পর বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ ক্ষেত্রে কপট বন্ধুত্বের অভিনয় করে মাত্র। আর নারী কেন, পুরুষেরও আলাদা অস্তিত্ব কিংবা একক জীবন আমাদের সমাজে নেই। অবিবাহিত যার বয়স ৩৫ পেরিয়ে গেছে এমন পুরুষকে দৈনিক অন্তত তিনবার জবাবদিহি করতে হয় কেন বিয়ে করছেন না। প্রাসঙ্গিক বিদ্রূপসহ। সমাজ পুরুষকে যেমন একক জীবন গড়তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তার সহজাত প্রকৃতিগত তুলনামূলক সুবিধা কাজে লাগিয়ে। নারীও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণের চেষ্টা করে তবে প্রকৃতিগত তুলনামূলক অসুবিধা (যেমন দৈহিক নিরাপত্তা) তাকে বাধাগ্রস্ত করে।

একক জীবনযাপনের জন্য সমাজ তখন তৈরি হয় যখন সমাজের বস্তুগত সমৃদ্ধি ঘটে। বস্তুগত সমৃদ্ধির কারণে মানুষের মধ্যে Individualism develop করে। তখন মানুষ তার জীবনযাপনের অবকাঠামোগত সুবিধাগুলোর একক ব্যবহার কামনা করে যেমন- আলাদা রুম, আলাদা টিভি, আলাদা গাড়ি ইত্যাদি। এমনকি যৌথ পরিবারের বদলে একক পরিবারে বসবাস করতে আগ্রহী হয়। বস্তুগত সমৃদ্ধির ফলে মানুষের মাঝে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ঘটে প্রাথমিক পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা যখন ঘটে তখন পাশাপাশি বাসায় থাকলেও কেউ কাউকে চিনবে না। প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। কারো জীবনযাপন অন্যের জীবনযাপনের সমস্যা সৃষ্টি না করলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তবে একক জীবনের প্রাপ্তি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে, তাতেও Cost & Benefit আছে। পরিশেষে অনামিকা আপনাকে বলছি, সমস্যা সব সমাজেই আছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি।

নিরাপত্তা, স্বাধীন সত্তা, মর্যাদা নিয়ে বাঁচার পূর্বশর্ত হলো সুশাসন আর সুশিক্ষা এবং বস্তুগত সমৃদ্ধি। যা আমাদের সমাজে নেই। এ জন্য প্রথমে প্রয়োজন সুশাসন ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনীতির বর্তমান ধারা পরিবর্তন। সুশাসন, সুশিক্ষা নিশ্চিত হলে বস্তুগত সমৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আসবে। পরিবর্তিত হবে মূল্যবোধ, জীবনযাপন।

ধন্যবাদ, আপনাকে সমাজের মূল ক্ষতটাকে চিহ্নিত করে চিঠি লেখার জন্য।

নিজামুল করিম

সহকারী অধ্যাপক,

দেবিদ্বার এমএ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা

অনামি পুরুষের কথা

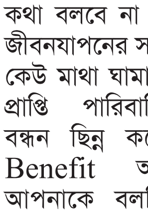

আসলে নারী-পুরুষ বৈষম্য বা বিভাজন ব্যাপারটি আপেক্ষিক। পুরুষ শাসিত সমাজ, পুরুষশাসিত সমাজ বলে চেঁচানো সম্পূর্ণ বাতুলতা। এর দ্বারা

নারীদেরকে শুধু পুরুষ বিদ্বেষীই করে তোলা হচ্ছে। এছাড়া নারীর কল্যাণে এ মতবাদটি কোনো কিছুই দিতে পারছে না। না নিরাপত্তা না স্বাধীনতা। এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক, তা যেমন অস্বীকার করার জো নেই তেমনি নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের ব্যাপারটিও।

এর প্রমাণে কিছু ঘটনা আমি বলি-

আমার ব্যক্তি পরিবারের কথাই ধরা যাক। শুধু একজন নারীর জন্যই পরিবারের সবার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। সংসারে সুখ নামক জিনিসটি কি? তা আর বলতে পারি না। আর কিছু নয় শুধু এ মহিলাটি যদি তার মুখটা সংযত রাখে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সংসারে পুনরায় সুখের সুবাতাস বইবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধবে কে! কার এতো বড় পাটা আছে যে, তাকে বোঝায়- কারণ যে জেগে জেগে ঘুমাতেই অভ্যস্ত, তাকে জাগানো বড়ই মুশকিল। যে কেউ যদি তাকে বুঝাতে যাবে, কৌশলে হোক কিংবা সরাসরি যেভাবেই বুঝাতে যান না কেন, এমনভাবে ধরবে যে, যেন ভীমরুলের চাকে আপনি ঢিল ছুঁড়েছেন।

আমাদের সমাজের বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটুকু বুঝেছি যে, পৃথিবীর তাবৎ মানুষ এক- কি নারী- কি পুরুষ তবে মৌলিক কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে তা ভুললে চলবে না।

তাই আমি বলি যে, আপনারা যাকে পুরুষশাসিত সমাজ বলে থাকেন আমি তাকে বলি শয়তান শাসিত সমাজ! অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ মানুষ এক হলেও এদের আমি ভাগ করেছি দু'প্রকারে- ভালো মানুষ ও খারাপ মানুষ।

এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে, প্রকৃত মানুষ এবং অমানুষ এই উভয়েরই চরিত্র সংজ্ঞায়িত করা এবং সে চরিত্রের আলোকে বিচার করে মানুষ নামের অমানুষদের এ সমাজ থেকে চিরতরে উৎখাত করা এবং এমন সামাজিক বাঁধন তৈরি করা যেন কোন মানুষ-মানুষ থেকে অমানুষে পরিণত হতে না পারে। কিন্তু তবুও কথা থেকে যায় যে এই চরিত্রটি সংজ্ঞায়িত করবে কে?

এক তাপদগ্ধ পুরুষ

শহীদ নয় যোদ্ধা হতে হবে

আমি আমার বন্ধুর নাম মিলিয়ে এ চিঠি লিখছি। অনামিকার চিঠির উত্তরে আমি শ'খানেক মেয়ের কথা লিখতে পারি যা অনামিকার সমস্যা থেকে ভিন্ন হবে না। বরং আরো খারাপ। এখানে বলে রাখতে হয় আমি কাজ করছি একটা এনজিওতে। এ কাজে আমাকে এক সময় বেশির ভাগ দিনই বাইরে গ্রামীণ অঞ্চলে কাটাতে হতো। এখানেই এক বিভ্রান্তি দেখা গেলো, আমাকে এমন অঞ্চলে পাঠাতে হতো যেখানে আমাদের নিজস্ব থাকার জায়গা আছে। কারণ আমি মেয়ে বলে নিকটস্থ কোনো হোটেলে গিয়ে উঠতে পারি না। একলা একটি মেয়ের হোটেলে ওঠা সেফ তো নয়ই দেখতেও ভালো দেখায় না। এরই মধ্যে আমার সঙ্গে পরিচয় হলো একটি ছেলের। একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক একটু গভীর হলো। আমার পারিবারিক সমস্যা হলেও ভাবলাম বিয়ে তো করতেই হবে। যার জন্য ও যখন বিয়ের কথা তুললো তখন আমি সায় দিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতেই ও বললো অফিসকে বলে তোমার চাকরিটা একটু বদলে নাও। তখন একটি পদ খালি হয়েছিল যাতে ট্যুর প্রয়োজন হতো না। কিন্তু সে পোস্টে গেলে আমার উন্নতি থেমে যেতো। ও জেনেশুনে চাপ দিতে লাগলো। যেহেতু ও আমার চেয়ে পুরনো কর্মী ও উচ্চ পদে ছিল, সে বললো 'আমি বললেই পোস্টটা তুমি পেতে পারো। অনেকে চাচ্ছে ওটা নিতে।' আমার ভালো লাগলো না। ও বললো তোমার ট্যুর আমার পরিবার পছন্দ করে না। বলে, বাউন্ডুলে বউ ঘরে এলেই বা কি! আমি অনেক চিন্তা করে বিয়ের সম্ভাবনাকেই বাতিল করে দিলাম। ও অবাক হলেও কিছু বললো না।

অনামিকা যা বলেছে তা হলো মধ্যবিত্তের নৈতিকতার সামন্ততান্ত্রিক ও আধিপত্যের একটি দিক। সমাজ একটি মেয়েকে অরক্ষিত রাখতে চায় না, চায় রক্ষিতা। কিন্তু আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এবং নগর বস্তিতে স্টাডি করতে অন্য একটি জগৎ দেখেছি। সেখান থেকে দু'-তিনটি আমি এখানে তুলে ধরছি।

ক. নেত্রকোনার একটি পরিবারে দেখলাম, একটি পরিবারের তিনটি ছেলের প্রথমজন এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হতে চায়। আর যদি আমি তার চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি তবে অন্য কথা। এই পরিবারের খেতি জমি তেমন নেই। অন্য দুটি ছেলের একজন ৪র্থ শ্রেণী, অন্যজন ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। পিতা বেশ গর্বিত। বললাম, কিভাবে খরচ চালান। ও ক্ষেতে কাজ করে? না, শিক্ষিত হয়েছে, ক্ষেতে কাজ করতে চায় না। আমিই করি। অল্প জমি, হয়ে যায়। ওরাও মাঝে মধ্যে হাত লাগায়। তবে পড়াশোনা চলে কিভাবে? এই কৃষকের আরো তিন মেয়ে আছে। তারা ঢাকায় থাকে। বড় মেয়ে বাসা বাড়িতে কাজ করে। বয়স বিশ বাইশ হবে। আর দু' বোনের মেজটাকে বড় মেয়েই ঢুকিয়ে দিয়েছে একটি গার্মেন্টসে। বয়স ১৭/১৮ হবে। ছোটটি থ্রিতে পড়তো বিনা পয়সায়। তাকে স্কুল থেকে ঢাকায় নিয়ে বাসা বাড়িতে দিয়েছে বাবা নিজে বড় মেয়ের মাধ্যমে। এই পিতা প্রতি মাসে ঢাকা চলে যান তিন বোনের উপার্জন পুরোটা নিয়ে আসেন। বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন না? একটু ভেবে বললো, বড় মেয়ে এখন গ্রামে বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের বয়সও নেই। যে বাড়িতে কাজ করে সে বাড়ির মেম সাহেব ওকে শহরেই বিয়ে দেবেন। ওরা ওকে খুব ভালোবাসে। মেজ মেয়ের ঠিকানা নিয়ে আমি ঢাকার গার্মেন্টসে দেখা করি। দেখতে বেশ সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ার পর ঢাকায় চলে এসে বাসা বাড়িতে কাজ নেয় বড় বোনের সঙ্গে। বড় বোনটিই তাকে সাহেবদের বলে গার্মেন্টসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ মেয়েটি গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। বিয়ে টিয়ে করবে না? তরুণী হাসে, কে আমারে বিয়া করবো? যাদের লগে কাম করি তারা গেরামে গিয়া বিয়া করে আসে। তারা শহরের বউ হইতে বলে। গ্রামে লইবো না। এখানে রাখবো। আমার ওপর থাকবো। নিজের ট্যাকা-পয়সা গ্রামের বউরে দিয়া আইবো। আবার আমারে ছাইড়া দিবো যখন ইচ্ছে হইবো। কত দেখলাম এ বিয়া! না বিয়া আর হইবো না। তবে অসুবিধা হয় না? চইলা যায়। দোয়া কইরেন যাতে ভাইগুলো চাকরি পায়। ওরা আমাদের গ্রামে নিয়া যাইবো।

ওই বস্তিতে ওর বড় বোন ও ছোট বোনকে ডেকে এনেছিল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বড় বোনের বয়স ঠিক ২২ বছর বলে মনে হয় না। আরো বেশি। তবে সুন্দরী ছিল খুবই। বিয়ে হয়েছিল। স্বামী তুলে নেয়নি। বাপের তখন টাকা ছিল না। মেয়েটি টাকা উপার্জন করতে এসেছিল। সে টাকা স্বামী নিতো কিন্তু বউকে ঘরে তুলতো না। বউ ইনকাম সোর্স। এখন টাকা স্বামীকে না দিয়ে বাবাকে দেয়া শুরু করলো। ডিভোর্স হয়নি। স্বামী আবার বিয়ে করে সংসার করছে। টাকা এখন নেয় বাবা। ছোট্ট মেয়েটি খুব চটপটে। মনে হলো ওর শহরে ভালোই লাগে। গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। গ্রামে গেলেই তার জ্বর বা ডায়রিয়া হয়।

আমি ওখানে ওই বস্তিতে আরো কিছু মেয়ের সঙ্গে কথা বলি। তারা একাই থাকে দু'-তিন বান্ধবী মিলে। কয়েকজন ছেলের শহরের বউও হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। সতীত্বের সংস্কার এদের নেই কিন্তু গোপনীয়তা আছে। বড় মেয়েটি মাঝে মাঝে বস্তিতে থাকে। ছোট বোনটি হাসে। 'ওর একজন আছে!' মেম সাহেব ব্যাপারটা বোঝে। ছুটিও দেয়। ওরা তিনজনই হাসে। বিষয়টি জৈবিক। অন্য প্রশ্ন করলাম না।

ঘটনার দুটো দিক আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন। এখন মেয়েরা এই নিম্ন শ্রেণীতে যে উপার্জন করে তার মালিকানা বাবা, স্বামী বা পুরুষের। উপার্জনের ওপর

তার হাত নেই। আমি অন্যান্য মেয়ে এবং কিছু বাসা-বাড়িতে কর্মরত মেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি টাকাটা গ্রামে পাঠায় বাবা-মা তো আছেই। না থাকলে বেকার ভাই, চাচা এমনকি মামা পর্যন্ত এ টাকার ওপর আধিপত্য চালায়। না দিলে কি হবে? কি আর হবে 'আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।' এই গ্রামীণ বন্ধন থেকে ওরা মুক্ত হতে চায় না। তবে হতে হয়, আরো অনেক পরে। অনেককে টাকা হাওলাত দেয়, ফেরত পায় না। অনেক মামা জমি রাখছে বলে টাকা নেয় পরে গিয়ে দেখে তার নামে কোনো কাগজ নেই, সব মামা তার ছেলের নামে করেছে। নাম ওর, জমি তোরই থাকলো। অসুবিধা কি?

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত হলো- মোরালিটি, সতীত্ব ইত্যাদি। এটা গ্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। এটা আর সেই গ্রামের মেয়ে থাকে না। হয়ে যায় নাগরিকা। এটা নিয়ে নগর মধ্যবিত্তের মতো ওদের অতো চিন্তা নেই। সত্যি বলতে কি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি ওরা খুব কম বয়সেই গ্রামেই সতীত্ব হারায় বয়স্ক, আত্মীয়স্বজনদের কাজিনদের সঙ্গে। নিরাপত্তা, বদনাম ইত্যাদিকে ওরা গ্রামেই রেখে আসে। এটা ওয়ানওয়ে টিকিস টু হেল অর ফ্রিডম আপনি মধ্যবিত্ত হিসেবে ব্যাখ্যা যা ইচ্ছে দিতে পারেন। এটা বৃহত্তম সমাজের চিত্র।

এবার আসুন এক অনামিকার মতো এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের কথা তুলে ধরছি।

খ. এরা দুই বোন এক ভাই। বাবা চাকরি করেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। বড় চাকরি কিন্তু বেতন লিমিটেড। বেশ ভালোভাবে চলাফেরা করে কিন্তু খুব বেশি বেহিসেবি হতে পারে না। আধুনিক পড়াশোনা করা বাবা-মা। মা মেয়েরা বড় হবার পর চাকরি নেন। তার চাকরিটাও ছোট নয়। ছেলেমেয়েরা এর কারণও বুঝতে পারলো। বড় বোনটি ভর্তি হয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। বেশ পয়সা খরচ। এর মধ্যে ছেলেটি 'এ' লেভেল দিচ্ছে। তাকে বিদেশ পাঠাতে হবে। স্বামী-স্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এর মধ্যে বড় মেয়ে বিয়ে করলো, বিরাট খরচ হয়ে গেলো। মেয়েরা বোঝে ভাইটি পড়তে চায় কানাডায়। সে টাকা হাতে রাখতে হবে বাবা-মায়ের। এর মধ্যে বড় মেয়ের স্বামী হঠাৎ চলে গেলো চাকরি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে। মেয়ে বাপের বাড়ি এসে উঠলো। ছেলে বলেছে তিন মাসের মধ্যে নিয়ে যাবে। দেড় বছরে কিছু হলো না। তারপর ঘটলো ১১ সেপ্টেম্বরে অঘটন। স্বামী দেশে আসতে ভয় পায়, কারণ যদি ফের ফেরার অনুমতি না পাওয়া যায়! এদিকে 'এ' লেভেল শেষ করে ছেলে বসে আছে, কানাডার চিঠিও এসে গেছে। কিন্তু আরো টাকা চাই। ঠিক হলো উত্তরার যে জমিটা অ্যালটমেন্ট পেয়েছিলেন ওটা বিক্রি করে দেবেন। কথা ছিল তিন ছেলে মেয়ে তিন অ্যাপার্টমেন্ট হবে মা-বাবা থাকবে নিচের তলায়।

বড় মেয়েটি তার নিজের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুন্দরী, স্মার্ট, ইংরেজি ভালো জানে। এক বিদেশী মিশনে চাকরিও পেয়ে গেলো। জীবনধারা বদলে গেলো। হলুদ প্লেটওয়ালা গাড়ি তুলে নিয়ে যায়। নামিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যায়। ফ্ল্যাটে সম্মান বেড়ে গেলো। ছেলে চলে গেলো কানাডায়। এদিকে ছোট বোনটি 'এ' লেভেল দেবার সময় হয়ে গেলো। সে অনেক বন্ধু নিয়ে ঘোরাফেরা করে। মা-বাবার আপত্তি নেই। শুধু সাবধান করে দেয় যেন 'খালা'দের সামনে না পড়ে। এখনো আমাদের নৈতিক অবস্থান পরিবারের ভেতর এক, সামাজিকভাবে অন্য। ছোট মেয়েটি বড় বোনকে বলে, আপা যদি বিবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাই তবে কিসে পড়বো। ভাবছি পরীক্ষা না দিয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ি তোমার মতো। না। নর্থ সাউথে পড়বি। আমি পড়াবো। পারলে আমেরিকায় গিয়েই পড়বি। আমি পাঠাবো। অবাক ছোটবোনটি। আপা বদলে গেছে। অনেক দৃঢ় এবং সুন্দর।

গ. তৃতীয় পরিবারটি এক শিল্পপতির। এ পরিবারের উত্থান সামন্ত অবস্থান থেকে রাজনীতি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ম্যানপাওয়ার দিয়ে শুরু করে ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রির নামে লোন নিয়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় এখন বিত্তবান। তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বাবা-মার শিক্ষাদীক্ষা তেমন না থাকলেও ছেলে মেয়েদের ভর্তি করে নামীদামি স্কুলে। এখন এরাই বাড়ির কালচার নির্ধারক হয়ে ওঠে। কোথায় বাড়ি কেনা হবে। কি কি গাড়ি কিনতে হবে। এদের মাধ্যমে বাড়িতে আরো সব কোটিপতিদের ছেলে-মেয়েদের আগমন ঘটে। হৈ চৈ চলে। এখানে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তফাৎ ঘটে না। যদিও মা দুই মেয়েকে একটু বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়েরা তাকে 'ক্ষেত' বলে চুপ করিয়ে দেন। তিনিও হাসেন। এরা কি পড়ে বা বিদেশে কোথায় যায় বাবা-মা তেমন খোঁজ রাখতে পারেন না। বড় মেয়েটি দু'বার বিয়ে করেছে। প্রথম বিয়ে হয় ১৭ বছর বয়সে আরেক কোটিপতির ছেলের সঙ্গে। ওটা টেকে দেড় বছর। দ্বিতীয় বিয়ে করে আমেরিকায় আরেক কোটিপতির ছেলেকে। ছেলেদের মধ্যে বড় ছেলে দেশ-বিদেশ ঘুরে এখন এসে বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দ্বিতীয় ছেলে মাঝে মধ্যে বসে অফিসে। কিন্তু সে মনে করে পুরো অফিস কম্পিউটারাইজড করতে হবে। এদের বড়জন বিয়ে করেছে যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী ভারতীয় শিখ মেয়েকে। মেয়েটিও বসে অফিসে। সে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্সি আনার চেষ্টা করছে। ছোট ছেলেটি কোথায় থাকে কেউ জানে না। অনুমান করা হয় ড্রাগের জগতে গেছে। মাঝে মাঝে ই-মেইলে জানা যায় তার অবস্থান। ছোট মেয়ে এক ভারতীয় গায়কের সঙ্গে বসবাস করে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। ক্রেডিট কার্ডে দেনা হলেই শুরু ই-মেইল। কোথায় ডলার পাঠাতে হবে। এরই মধ্যে শিল্পপতির হার্ট অ্যাটাক হয়। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা করে স্বামী-স্ত্রী হজে যান। সেখান থেকে ফিরে দু'জনই আল্লাহর নামে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। ভিন্ন বাড়িতে উঠে গেছেন। মহিলা আধুনিক হবার সাধনা করেছেন এতোদিন এখন চেষ্টা মুসলমান হতে। হেজাব আসে মক্কা বা ইরান থেকে। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে ডাকেন ধর্মীয় আলোচনায়। স্বামীও বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের সঙ্গে বসেন। ব্যবসা দু' ছেলের হাতে।

এ তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথম মিল হলো প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব নৈতিকতা রয়েছে। রয়েছে পারিবারিক গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং প্রজন্ম বিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা। তবে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে মেয়েদের নৈতিকতার মানদন্ড ভিন্নতর নয় যতখানি মধ্যবিত্তের মধ্যে রয়েছে। আমার পুরো বক্তব্যের বটম লাইন হলো অনামিকা সামাজিক শিকার নয়। তিনি যে অবস্থান নিজের জন্যে নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন সেভাবে ঘটছে না বলে তিনি একে আত্মত্যাগী মনে করছেন। সতীত্ব ইত্যাদিকে সামাজিক অবস্থানে অনেক ওপরে রাখতে চাইছেন নিজেই এবং যার সমর্থন প্রশংসা তিনি সমাজের কাছে চাচ্ছেন। নিজের জৈবিক অবদমন ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তি ইচ্ছে। এটাকে সামাজিক বিতর্কের বাইরে নিতে হবে। নিতে হবে এ প্রজন্মকেই।

বাড়ি ভাড়া পাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো যারা ঢাকা নির্মাণ করছেন তারা কেউ একক ব্যক্তির কথা ভেবে ফ্ল্যাট বানাচ্ছেন না। বানালে ভালো ব্যবসা হতো। এখন বানানো হবে।

অনামিকা ধন্যবাদ তিনি তার সমস্যা তুলে ধরে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন যদিও তার সঙ্গে আমার বড় রকমের দ্বিমত রয়েছে। আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না? না, আমি আর বিয়ে করিনি। বন্ধুবান্ধব আছে। বান্ধবীও অনেক। একা মনে হয় না। বিয়ে করবো না প্রতিজ্ঞা করি না। ওটার প্রয়োজন অনুভব করি। সুযোগ হলেই করবো। নিজেকে সামাজিক 'শহীদ' মনে করি না, যোদ্ধা মনে করি। এ প্রজন্মের দায়িত্বই যুদ্ধ। যেমন '৭১-এর জেনারেশনের ওপর যুদ্ধের দায়িত্ব এসেছিল।

ইয়াসমিন নমিতা হক

ঢাকা

সময় রুখে দাঁড়ানোর

আমরা পাঠক মতামতের ভিত্তিতে অনামিকাকে রুখে দাঁড়াতে বলেছি। কিন্তু দাঁড়াবে কার বিরুদ্ধে? পরিবার, সমাজ, পুরুষতন্ত্র বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে? না, আমরা জানি যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে গেলে প্রথমে উঠে দাঁড়াতে হয়। অনামিকা কিন্তু কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেননি। তিনি একা থাকার নাগরিক অধিকার চেয়েছেন। তাতেই সমাজ মুখোমুখি হয়েছে অনেকগুলো প্রশ্নের। দেখা গেল এ নগর নারী পুরুষ নয় একজন মানুষের একক সত্তা নিয়ে বাঁচার রাইট নেই। ফ্ল্যাটে থাকতে গেলে বাড়িওয়ালার পারমিশন, পাড়ায় কৈফিয়ত দিতে হবে পাতি মাস্তানকে, চাঁদা দিতে হবে চাঁদাবাজকে। খোলা পার্কে হাঁটলে, চাঁদা নেবে পুলিশ। নইলে বলবে, মাগী থানায় চল।

অনামিকার চিঠি নিয়ে প্রচ্ছদ করা হয় ২৫ এপ্রিল। এর পরের দুটি প্রচ্ছদ প্রকাশিত হয়েছে বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয়। একটি হলো প্রেম নিয়ে এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাদের ভাবনা (বর্ষ শুরু সংখ্যা)। দ্বিতীয়টি একটি রিপোর্ট (বর্ষ ৫ সংখ্যা ৫২) সাইবার ক্যাফের বুথ ব্যবসা অন্তরালে কি ঘটে।

অনামিকার চিঠি এবং অন্য দুটো সমগোত্রীয় নারী পুরুষ সম্পর্কের কথাই তিনটি লেখায় এসেছে। অনামিকার মৌলিক প্রশ্ন একক জীবনের অধিকার কেন পাবে না। কিন্তু তার পত্রের দুর্বল দিক হলো তিনি হতাশা থেকে লিখেছেন। এবং দায়িত্বকে আত্মত্যাগ বলেছেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে সেটা তার একান্ত নিজের ব্যাপার। ক্ষমতা সক্ষমতার দায় দায়িত্ব তার নিজের। একজন তো প্রশ্নই তুলেছেন, ব্যক্তি চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব সমাজের ওপর চাপিয়েছেন, এটাও ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার।

পাঠকবর্গ যদি প্রতিটি মতামত পড়েন দেখবেন আমাদের আর কোনো বক্তব্য দিতে হয় না। যেমন আফসানা মিমি তার অনেক কথায় বলেছেন সুর ও অসুরের কথা, শুভ অশুভের কথা। ভালো ও মন্দকে ভাগ করতে হবে। প্রেমিকের হাত ও হায়নার হাত চিহ্নিত করতে হবে। মেয়েদেরই করতে হবে। একটু এগিয়ে এসে। যদিও আফসানা মিমি যুক্তিগ্রাহ্যতার মধ্য দিয়ে পুরুষদের বেরুবার পথ দিয়েছেন। এটাও হয়তো প্রয়োজন। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে অনামিকার সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। একটি জেনারেল টার্মে বলা হচ্ছে মেয়ে বলেই এই সমস্যা। এটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু দুটো বিষয় অনেকে এড়িয়ে গেছেন। যেখানে সমস্যার মূল সূত্র। তা হলো- জৈবিক চাহিদা এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুশীলন।

জৈবিক চাহিদার একটি যৌন জীবন। সেটি একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। পুরুষ যখন একক জীবনযাপন করে তখন সে তার যৌন জীবনকে 'প্রয়োজন নেই' বললে বন্ধুরা ক্লীব বলে রসিকতা করে। সে জন্যই সে বিষয়টিকে ঘিরে একটু রহস্য রাখে বা তার যৌনজীবন গোপন করে না। কিন্তু একক মেয়েকে যৌন জীবন সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয় শুধু নয়, তার যৌন অবদমনকে সামাজিক বিষয়ে পরিণত করতে হয়। এই সতীত্বের ট্যাবু নিয়ে তাকে বড় হতে হয়েছে এই যৌন ক্ষুধার্ত সমাজে। একজন একটি উপমা দিয়েছেন তার মতামতে। শিশু বয়সে তাকে একজন বড় ভাই (!) শরীরে হাত দিয়ে ভীত করে তুলেছিল। আমাদের দেশে কাজিন বা বৃদ্ধ পারিবারিক সদস্যরা গোপনে এ কাজটি করে থাকে। একজন কোনো না কোনো সময় এই ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনে কাউকে বলতে পারে না। এই ট্রমা মেয়ে জীবনব্যাপী তাড়িয়ে ফেরে বা শরীর সম্পর্কে অতি সচেতন করে তোলে। যদি আমাদের বর্তমানে পিতা-মাতারা এ বিষয়ে শিশু সন্তানের সঙ্গে আরো একটু খোলাখুলি হন তবে তারা বিষয়টিতে প্রতিবাদ করতে শিখবে বা বাধা দিতে পারবে।

একটা কথা বলা হয় শিশু সন্তানের কাছে পিতামাতার প্রেম থাকে দৃষ্টির আড়ালে, ঝগড়া বিবাদ সবার সামনে এটাও তাকে ক্ষতি করছে। ভালোবাসাকে মানুষ গোপন করে, হিংস্রতাকে নয়।

এখানে আমরা আর একটা মৌলিক আলোচনায় যেতে পারি। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কেন? বুদ্ধি বেশি। হ্যাঁ তাই। অন্য প্রাণীর চেয়ে শক্তিতে দুর্বল হয়েও বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে সবচে' বেশি। অনেক প্রাণী পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ ক্রমেই পৃথিবীময় বসত বানিয়ে ফেলছে তার বুদ্ধি দিয়েই। সব প্রাণীর 'মেটিং' মওসুম আছে। বছরের যে কোনো সময় বা সব সময় সব প্রাণী যৌন জীবনযাপন করে না, করতে পারে না। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে আবেগ তৈরি করেছে, ভালোবাসা তৈরি করেছে, যৌনবাসনা কল্পনায় সৃষ্টি করতে পারে মনে। মনন দিয়ে একজনকে কামনা করে যাকে সে প্রেম বলে। এগুলো করেছে সুশীল সমাজের জন্য। জীবনকে আরো মোহময় করার জন্য। সে জন্য সবচে' বড় জৈবিক প্রবৃত্তিকে সে বশে এনে তার ব্যবহার করছে অন্যভাবে।

তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে ধর্ম এসেছে। এসেছে ধর্ম অনুশীলন। সুশীল সমাজের জন্য অনিশ্চয়তা, প্রকৃতির রহস্যময়তা থেকে রক্ষার জন্য। মানুষ মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও পৌঁছাতে চেয়েছে, তারই জন্য ধর্ম। কেউ মৃত্যুর পর বেহেস্ত যাবে বা দোজখ অথবা কেউ নির্বাণ প্রাপ্ত হবে। যার যেমন ইচ্ছে। কিন্তু এখানেই হয়েছে সমস্যা। ধর্মীয় ফতোয়াবাজ বা পান্ডারা পৃথিবীতেই স্বর্গ নরকের উপমা তৈরি করতে চায়। মানুষের পাপ পুণ্য বিচার এখানেই করতে চায়। রোজ হাসরের অপেক্ষা করতে তারা রাজি না। তাদের এই ফতোয়া মূলত নারী সমাজকে কেন্দ্র করে। এখানে কয়েকজন চিঠি লিখেছেন নারীর পোশাক-আশাকই পুরুষদের উত্তেজিত করে। ধর্ম যদি মানুষ সুশীল করতে না পারে, যদি পশুপ্রবৃত্তি থেকে বের করে অন্য প্রাণী থেকে তফাৎ করতে না পারে তবে ধর্মীয় অনুশীলন এলো কেন? শুধু নারীকে বশে আনতে নিশ্চয়ই ধর্মের নয়, ফতোয়া নয়।

মতামতের মধ্যে প্রায় সবাই অনেক বিষয়ে কথা বললেও ধর্মীয় অনুশাসন অপব্যবহার ও যৌন জীবন নিয়ে আলোচনায় যাননি। দুটো বিষয়ই আসলে ব্যক্তিগত। এটা সামাজিক বিষয় হতে পারে না। কিন্তু যখন কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তখনই এ দুটো বিষয় উঠে আসে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।

আমরা আমাদের দেশের নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করি। আসলে আমরা বিষয়টি গোপন করি। প্রত্যেক পরিবারে নৈতিকতার নিজস্ব মানদন্ড আছে যা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করি না। একটি ছোট সংস্থার ছোটখাটো পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বিয়ের বাইরে নারী-সঙ্গ ভোগ করে অন্তত ৩১ ভাগ পুরুষ। সেখানে ১১ জন নারী বিয়ের বাইরে পুরুষ সঙ্গির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। গোপনীয়তা, অকথিত থাকা, কোনো কথা বলবে না ইত্যাদি এখানকার কালচার। সে জন্য একটি মেয়ে যখন ছোট কোনো অপরাধ করে ফেলে বা অপরাধের শিকার হয় সে চেপে যায়। কারণ সমাজে এটা আর ঘটেনি বলে সে মনে করে।

নারী পুরুষ সম্পর্কে নারীর শরীরই যেন সব বাধা। বাসে উঠতে পারবে না তার বক্ষদেশ কিছু স্পর্শ করতে পারবে না। শরীর তো শরীরই। এটাকে পুরুষরাই সংরক্ষণ করতে চায়। এই শরীর নিয়ে ছোটবেলা থেকে তাকে 'জুজু' দেখানো হয়।

মেয়েটি মানুষ হয় না। জুজুর ভয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

যখন বোঝে এটা 'জুজু' তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। এবং হা হুতাশ করে বেনামে পত্র লেখে জনপ্রিয় পত্রিকায় নিজের অবদমনের কথা বলতে, ত্যাগের কথা বলতে। ফেলে আসা জীবনটা ফিরে পাবে না জেনেও। নতুন প্রজন্মের অনামিকারা অপেক্ষা করবেন না। রুখে দাঁড়ান দেরি হবার আগেই।